

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

"সোনার সংসার"

পুস্তকখানি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ

মহাশয়কে

উৎসর্গ করিলাম

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পুস্তকের তালিকা

সোনার সংসার

জগতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য যে কতখানি, তাহা ধনীরা বুঝিলেও যাহারা দারিদ্রের মধ্যে প্রতিপালিত, তাহারাই বিলক্ষণ ঝে। এ পার্থক্য উৎপার চোখেও পড়িয়াছিল এবং সেজন্য সে পদে দে সঙ্কুচিত হইত।

সম্মুখে যে বিরাট অট্টালিকা দেখা যায়, ইহা ধনী সতীশ বসুর; নি একদিন উৎপার পিতা হরেন্দ্র মিত্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, ন্ততপক্ষে লোকে তাহাই জানিত।

হরেন্দ্রনাথ সতীশ বসুর পাটের ব্যবসায়ে প্রথম হইতে সহকর্ম্মী লেন, ধরিতে গেলে তাঁহার একান্ত চেষ্টাতেই সতীশবাবু ব্যবসাতে সম্ভব রকম উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

হরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া সতীশ সু লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে হরেন্দ্রনাথ সেই সুযোগে জের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার িক বেতন ছাড়া একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই।

তিনি যেমন ছিলেন স্বার্থশূন্য, সতীশ বসু তেমনই ছিলেন স্বা৺
নিজের সুখ সুবিধার জন্য তিনি সব কিছু করিতে সম্মত ছিলেন
করিতেনও তাহাই। হরেন্দ্র মিত্র তাঁহার বন্ধু এবং পরম উপ
হইলেও তাঁহাকে তিনি আন্তরিক বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ক
উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতেন, অথচ প্রকাশ্যে একান্ত নির্ভরতার
দেখাইতেন। চতুর সতীশ বসুকে বুঝিবার ক্ষমতা হরেন্দ্র মিত্রের
না,—তিনি তাঁহাকে অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়াই ভাবিতেন।

হরেন্দ্র মিত্র যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার
খুঁজিয়া পঞ্চাশটী টাকা ছাড়া স্ত্রী কাত্যায়ণী আর কিছুই পাইলেন ন

মৃত্যু-পথযাত্রী স্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিয়াছি
"তোমাদের জন্যে বেশী কিছুই রেখে যেতে পারলাম না, পথের ভি
ক'রে রেখে গেলাম। সতীশ বোসের কাছে আমার দুই হাজার
াত্র আছে, যদিও কোন লেখা পড়া নেই, তবু মনে হয়—সতীশ
বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই দুই হাজার টাকা উৎসার বিয়ে
জমা করেছিলাম, তুমি এই টাকাটা তুলে নিয়ে এখন দিন চালায়ে

স্ত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ও কথা এখন থাক্, তুমি—"

হরেন্দ্র মিত্র বলিয়াছিলেন, "না; এই কথাই আগে বলা দরকার
করি। উৎসার বিয়ে ভগবান ঠিক করবেন; তোমরা আগে
বাঁচবে—উৎসা বাঁচবে, তারপর বিয়ের ভাবনা।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সতীশ (
কাছে টাকা জমা রাখবার কোনও লেখা-পড়া আমার কাছে
না থাক, সতীশ বোস অস্বীকার করবেন না, এ ভরসা আমি

তুমি যেয়ো কাত্যায়ণী, তিনি হয় তো কিছু সাহায্য করতে পারেন। তোমাদের প্রতি এটুকু কৃতজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করবেন।"

কিন্তু তিনি জানতেন না, জগতে কৃতজ্ঞতা বড় একটা কেহ প্রকাশ করে না; যাহারা পরের উপকার মানিয়া লয়, বর্ত্তমানকালে তাহারা জ্ঞানহীন বলিয়া উক্ত হয়।

হরেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পরে কাত্যায়ণী কোনরকমে অলঙ্কারপত্র বিক্রয় করিয়া শ্রাদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। তাহার পর কলিকাতায় সতীশ বাসের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হরেন্দ্র মিত্রের ব্যায়রামের সংবাদ সতীশবাবুকে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু সতীশবাবু আসেন নাই—কোন সংবাদও দেন নাই।

আট বৎসরের মেয়ে উৎসাকে লইয়া পাড়ার একটী ছেলের সহিত কাত্যায়ণী যেদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন, সেদিন আশা-নিরাশায় তাহার অন্তর কাঁপিতেছিল।

কোন ক্রমে গেটে দ্বারোয়ানের হাত এড়াইয়া কন্যাসহ তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ ঘোস শুনিলেন, হরেন্দ্র মিত্রের বিধবা স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ দরকার আছে। শুনিয়া তাঁহার প্রশস্ত ললাটে কয়েকটী চিন্তার রেখা পড়িল।

কাত্যায়ণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সতীশ বসু গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন, সম্মুখের মানুষটির পরিচয় জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি, কি চান—?"

"আমি—আমি—"

সন্থ-বিধবার মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হইতে পারে না। ক্ষণকাল থামিয়া একটা দম লইয়া কাত্যায়ণী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমি মহেশপুর হতে আস্‌ছি ;—আপনার ম্যানেজার—মিত্রের স্ত্রী—"

স্বামীর নামটা উচ্চারণ করতে পারিলেন না, বালিকা উৎসা বলিয়া দিল, "আমার বাবার নাম, হরেন্দ্র নাথ মিত্র—"

সতীশ বোস তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বুঝেছি ; আমার কাছে কোন দরকার আছে—?"

কম্পিত-কণ্ঠে কাত্যায়ণী বলিলেন, "আছে ;—আমার স্বামী মারা গেছেন সে কথা শুনেছেন,—আপনাকে খবরও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি যাননি…"

সতীশ বোস বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একখানা পত্র পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমার অনেক কাজ, তা ছাড়া মেয়েটীর অসুখ—যেতে পারিনি ; সেজন্য আমার মনে ভারি কষ্ট রয়েছে।"

কাত্যায়ণী গোপনে চোখের জল মুছিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "তিনি মারা যাবার সময় বলে গেছেন, উৎসার বিয়ের জন্যে দু'হাজার টাকা আপনার কাছে জমা দিয়ে রেখেছেন—"

সতীশ বোস নিস্পন্দ হইয়া গেলেন—"দু'হাজার টাকা—আমার কাছে…!"

কাত্যায়ণী তাঁহার ভাব দেখিয়াই অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন ; তথাপি জোর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনার কাছে—তিনি বলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন—এখন সেই টাকায় আমাদের খাওয়া-পরা

চালাতে, কারণ, তিনি তো এক পয়সাও রেখে যাননি। গহনা বিক্রি করে অতি কষ্টে তাঁর শ্রাদ্ধটা করেছি; কিন্তু খাই কি তার কিছু নেই। তিনি বলে গেছেন—”

সতীশ বোস বলিলেন, “বলে তো গেছেন, কিন্তু একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে টাকা রেখেছেন তার কোন লেখাপড়া আছে? ...কোন রসিদ—”

কাত্যায়ণী মাথা নাড়িলেন; বলিলেন, “না, তিনি বলেছেন কিছুই নেই, ও-সব রাখবার দরকার বোধ হয়নি।”

“দরকার বোধ হয়নি—”

সতীশ বোস গম্ভীরভাবে হাসিলেন; বলিলেন, “এ কথা কখনও সত্য হতে পারে, দু'হাজার টাকা তিনি আমার কাছে রেখেছেন— অথচ তার কোন লেখাপড়া নেই? ...আপনি একবার খুঁজে দেখবেন বাক্স-টাক্সগুলো, যদি পান, তা হলে আমার কাছে আসবেন।”

কাত্যায়ণীর চোখের সাম্‌নে সমস্ত অন্ধকার হইয়া আসিল—পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি তিনি দেওয়ালটা চাপিয়া ধরিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দারুণ অপমান তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “কিন্তু তিনি কি মিছে কথা বলে গেছেন?”

বাধা দিয়া সতীশ বোস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, “আপনি কি বলেন, আমিই মিছে কথা বল্‌ছি! আপনি যে সেই মৃত্যুপথ-যাত্রীর প্রলাপ শুনে সত্য বলে মনে করে আমার কাছে এসেছেন, এতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। আপনি স্ত্রীলোক, আপনাকে বেশী বলার্ম্

আমার অন্যায় হবে। আপনি বাড়ী গিয়ে ভাল ক'রে সব খুঁজে দেখবেন, যদি কাগজ পান, তা হলে আবার আসবেন, নচেৎ আসবার দরকার নেই।"

কাত্যায়ণী যে কি করিয়া, কি ভাবে উৎসাকে লইয়া পথে বাহির হইলেন, তাহা নিজেই জানেন না।

বালিকা উৎসা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল মা, ওঁরা কিছু দেবেন না? তবে কি করে আমাদের দিন চলবে?—আমরা কি খাব?"

মা চোখ মুছিয়া উত্তর দিলেন, "উপায়—ভগবান! তাঁর রাজ্যে কেউ কোনদিন না খেয়ে মরবে না বলেই জানি, আমরাও বেঁচে থাকব।"

*　　*

*

অনেক কাল পরে দেশে আসা।

কবে যে দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহা সরিতের মনে পড়ে না। বাল্যের কথা একটু-আধটু মনে পড়ে; সেটা যেন একটা স্বপ্ন। বাল্য হইতে কৈশোর কলিকাতায় কাটিয়াছে, তারপর গিয়াছে ইউরোপে। পাঁচ-ছয় বৎসর সেখানে কাটাইয়া গত বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া আসিয়া সে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি মাস-খানেকের ছুটি লইয়া সে জগন্নাথপুরে আসিয়াছে। সতীশ বোস এবং বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়াছেন।

এই সেই গ্রাম,—যাহার ছবি স্বপ্নের মত তাহার মনে জাগিয়াছিল। সরিত মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। বিলাতের গ্রামসমূহ সে দেখিয়াছে, কতদিন বাস করিয়াছে, নাগরিক ও গ্রাম্য-জীবনে মিশিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলার গ্রাম্য-জীবনে সে যাহা দেখিল, এমন আর কোথাও দেখে নাই।

সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—অন্তরের সঙ্গে সে গ্রহণ করিতেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়াছিল, সঙ্গে ছিল তাহার বন্ধু

বিনয়। সে কলিকাতায় কাজ করে, তিন দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে।

শুভ্র চাঁদের আলোয় সারা গ্রামখানি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে,—আকাশ মেঘশূন্য—পরিষ্কার! পিছনের মাঠ চাঁদের আলোয় হাসিতেছিল, সম্মুখে গঙ্গাবক্ষের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন জ্বলিতেছে। ওপারে গাছগুলি চাঁদের আলোয় বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। পৃথিবী যেন আজ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে,—মানুষের দুঃখ, বেদনা ভুলাইয়া দিতেছে।

সরিত নীরবে বসিয়া দূরের পানে চাহিয়াছিল,—পার্শ্বে বসিয়া বিনয় গাহিতেছিল—

আজ এমন যামিনী মধুর হাসিনী
সে যদি গো শুধু আসিত,
পরাণে এমন আকুল পিপাসা
সে যদি গো ভালবাসিত।

তাহার গুন্-গুন্ গানের সুরে সমস্ত স্থানটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—

সে যদি গো শুধু আসিত—
সে যদি গো শুধু আসিত!

বিনয় হঠাৎ থামিয়া যাইতেই সরিত তাহার পানে তাকাইল।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটি রমণী কলসীকক্ষে জল লইতে আসিয়াছিলেন

বিনয় সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি কাকী-মা! আপনি এই রাত্রে জল নিতে এসেছেন যে?"—

রমণী আর্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন, "সারাদিন সময় পাইনি বাবা, মেয়েটার বড্ড জ্বর হয়ে সারাদিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিল কিনা,—তাকে নিয়ে মোটে সময় পাইনি, এখন জ্বরটা কমেছে, তাই তাকে রেখে আসতে পেরেছি।"

রমণী কাত্যায়ণী।

জলে নামিয়া ঢেউ দিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া তিনি উঠিলেন; বলিলেন, "দিব্যি জ্যোচ্ছনা রাত্রি, ভয়ের ত কোন কারণ নেই, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি উঠো বাবা, খানিকক্ষণের মধ্যেই মেঘ আসবে; পশ্চিমের কোণটায় ঝোড়ো-মেঘ দেখা যাচ্ছে, গরমও পড়েছে তেমনি।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

সরিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চেনা?—কাকী-মা বললে যে?"

বিনয় উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কেবল আমারই চেনা নন, তোমাদের বাড়ীরও সকলেই চেনেন।"

সরিত বলিল, "যাক্ গে, গানটা নষ্ট হয়ে গেল! ধর আবার। চমৎকার গানখানা!"

বিনয় মুহূর্ত্তমাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "যাক্ গান আর হবে না; তার চেয়ে বরং কথা-বার্ত্তা চলুক।"

সরিত বলিল, "আমি ভাবছি, এক মাস ছুটির বাইশটা দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল, বাকি আর ক'টা দিনও সাঁ সাঁ করে কেটে যাবে। আবার ইচ্ছা হয়, এখানে যদি কিছুদিন থাকতে পেতুম!.... বাবা যে কেন এখানে থাকতে চান না, তা, বুঝিনে!"

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "থাকতে চান না অনেক কারণে; তার কয়েকটি বল্‌ছি;–সহরের লোকেরা প্রধানতঃ গ্রামে থাকতে চান

না ; অসুখ-বিসুখ, তারপর নানারকম অসুবিধা ; সাপের ভয়, বাঘের ভয়, জঙ্গল, ইত্যাদি—ইত্যাদি। তোমার বাবা শুনেছি উনিশ বছর পরে জগন্নাথপুরে এসেছেন।

সরিত বলিল, "কিন্তু আমার তো কোন অসুবিধা লাগছে না।"

বিনয় বলিল, "হঠাৎ এসেছো, আর একেবারে নূতন কিনা, অসুবিধা হলেও অসুবিধা বলে মনে হবে না। বেচারা গ্রামবাসীদের দুঃখ তো দেখনি, দেখেছ তাদের উপরের দিকটা,—ভেবেছ, ভারি শান্তিসুখে ওরা দিন কাটায়। কিন্তু তা নয় বন্ধু—তা নয়, এদের মত দুঃখ পায় না আর কোনও দেশের লোক।"

সরিত বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু কত অল্পে এরা সন্তুষ্ট হয় সেইটাই বল বিনয়। এরা কত দুঃখ সয়, কত ব্যথা বেদনা সয়, তবুও দেখ এদের মুখের হাসি মোছে না ;—সারাদিন খেটে সন্ধ্যাবেলায় এরা বাঁশী বাজাতে পারে, আর সকলের চেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি এদের সরলতা দেখে।"

বিনয় গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, এই সরলতা দেখে লোকে যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনি সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে এদের সর্বনাশ করে। এরা এমনি বোকা যে, হয়তো লোকের কাছে যথাসর্বস্ব জমা রেখে, তার একটা রসিদ পর্যান্ত রাখে না। এমন বোকা যে, কাউকে কথা দিয়ে সেই কথা রাখতে এখনো তারা যথাসর্বস্ব দিয়ে থাকে। সেই জন্যেই আমি বলি, এতটা সরল হওয়া কোনমতে ভাল নয় ; এর চেয়ে খানিকটা কুটিলতা নিলে হতো।"

সরিত বলিল, "জানিনে, এদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কোন

পিষ্ঠ এদের সর্বনাশ করতে পারে। যাক্, যাঁকে কাকী-মা বলে ক্লে, তাঁর মেয়ের অসুখ বললেন—তার—"

বিনয় বলিল, "ওঁর স্বামী একদিন তোমাদের কাজ করতেন সরিত, াতে গেলে, হরেন কাকা ছিলেন বলেই তোমাদের ব্যবসায়ে অসম্ভব রকম উন্নতি হয়েছে, নচেৎ কিছুই হত না। আজ ওঁর এমন দুর্দ্দশা যে, ায়ে বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ওঁর নেই। কষ্টে যে খাওয়া-পরা চলে, সে না দেখলে বিশ্বাসও করা যায় না।"

সরিত মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "ওঁদের মা মেয়ের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, কথা বোধ হয় বলা চলে, সরিত।"

সরিত বলিল, কিন্তু ওঁদের কি কিছুই নেই, ওঁর স্বামী কি কিছু রেখে যাননি?"

বিনয় বলিল, "রেখে গেলে আজ ওঁদের এ দুর্গতি হত না।"

সরিত একটা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু এ সব কথা আমায় বলা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, বাবা বর্ত্তমান রয়েছেন, তিনি থাকতে আমি কোন ব্যাপারে হাত দিতে পারিনে। তবে হ্যাঁ, বাবাকে যদি বলতে বল আমি বল্‌তে পারি—অনুরোধ করতে পারি, এর বেশী আর কিছু আমি করতে পারিনে।"

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "ওদের মাসিক পাঁচ সাত টাকা সাহায্য করাটাই সব কিছু নয়। তুমি যদি ওঁর মেয়ের বিয়েটা দেওয়ার জন্যে তোমার বাবাকে বল,—ইচ্ছা করলে তিনি অনায়াসেই দিতে পারবেন।

সরিত জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির বয়স কত হল?"

বিনয় হিসাব করিয়া বলিল, "বোধ হয় বছর পনের ষোল হ[illegible] তার কম নয়।"

সরিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "পাড়াগাঁয়ে এত বড় মেয়ে অবিবাহি[illegible] আছে! শুনেছিলুম, এখানে এত বড় মেয়ে ঘরে থাক্‌লে না[illegible] সমাজচ্যুত করে?"

বিনয় বলিল, "সোজা কথায় বলে, একঘরে। তা' ওঁরা প্রা[illegible] একঘরে হয়ে আছেন বই কি! উৎসা কোথাও যায় না, কাকা-মা[illegible] নিতান্ত কাজ না পড়লে বার হন না। আর অত বড় মেয়ে না রেখেই বা উপায় কি, মেরে ফেলা তো যায় না।"

সরিত চুপ করিয়া রহিল।

বিনয় বলিতে লাগিল, "আমাদের দেশের অবস্থা দেখ! ইউরোপ দেখে এসেছ, এ দেশের অবস্থাও নিজের চোখে দেখ। এই যে মেয়েটি —হয় ত ওর বিয়েই হবে না; অথচ সমাজের হুম্‌কি সহ্য ক'রতে না পেরে হয় ত আত্মহত্যা করবে, নয় ত অ[illegible]বে কোন তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষের বার্ত্তা নিয়ে কোন ষাট্‌ বছরের ব[illegible],—যে বিনা পণে মেয়েটীকে গ্রহণ ক'রবে—"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সরিত বলিল, "তারপর—?"

বিনয় বলিল, "তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে মেয়েটি বিধবা হবে।"

সরিত নীরব রহিল।

বিনয় বলিয়া চলিল, "অথচ দেশে ছেলের অভাব নেই, যারা

ছা করলে এমন সুন্দরী ও গুণবতী মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নিতে রে। কিন্তু সে কাজ কেউ করবে না;—এই ত দেশের দুরবস্থা! ন্তু এখন থাক্ এ সব কথা—সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে এলো, ঝড় াসবে; বাড়ী যাওয়া যাক্।"

ঈশানের কালো মেঘখানি সারা আকাশটাকে কত শীঘ্র জুড়িয়া ইয়াছিল, এতক্ষণ তাহা দেখে নাই; এতক্ষণে দৃষ্টি পড়িল।

বাতাস থামিয়া আসিয়াছে,—চিক্‌মিক্ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া ঠিল।

কোথায় ডুবিয়া গেছে চাঁদ, কোথায় ডুবিয়া গেছে তারা, ও-পারের ামবনে যে পাপিয়াটা খানিক আগেও ঝঙ্কার দিতেছিল, সে চুপ রিয়া গেছে।

সরিত বলিল, "কিন্তু গানটা তো শেষ হল না—!"

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "গান আজ থাক, এরপর ঝড়ের লোয় চোখে কাণে দেখতে শুনতে পাব না; আর গানটা তো াদের সম্বন্ধে, চাঁদই যখন ডুবে গেল, তখন গানের সার্থকতা থাকবে ক? চল—"

অগত্যা সরিতকেও উঠিতে হইল।

* *

*

এতদিন কেবল পেটের ভাবনাই করিতে হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা
উপর আর এক ভাবনা জুটিয়াছে—উৎসার বিয়ের ভাবনা।

কাত্যায়ণী অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন,—উৎসার পানে তাকাই
তাঁহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়ের বয়স পনের-ষো
বৎসর হইয়াছে ; এত বড় মেয়েকে কুমারী অবস্থায় অহোরাত্র সম্মু
রাখিয়া তিনি স্থির হইয়া থাকিবেন কি করিয়া !

আজ যদি স্বামী থাকতেন—!

কাত্যায়ণী চোখের জল সামলাইতে পারেন না, উৎসাকে লুকাই
তিনি চোখ মুছেন,—মনে মনে আর্ত্তভাবে বার বার বলেন, "ওগে
তোমার ভার তুমি কাকে দিয়ে গেলে,—আমি কি এ ভার বইতে
পারি !"

সতীশ বাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে কাত্যায়ণীর বিলম্ব হয় নাই
আজ-কালকার দিন, কেহ যে বিনা লেখাপড়ায় জমা টাকা ফিরাই
দেয়, এমন সততা দেখা যায় না। হরেন্দ্রনাথ মনিবকে অবিশ্বা
করেন নাই—সেই জন্যই লেখাপড়া করিবার আবশ্যকতা বোধ করে
নাই। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যে মনিবকে তিনি ক্রোড়পা
করিয়াছেন, তিনি যে সামান্য দুই হাজার টাকা নিজের কাছে রাখি
একেবারে অস্বীকার করিবেন, তাহা হরেন্দ্রনাথ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে

নাই। চিরদিন উপার্জন করিয়াছেন এবং সে উপার্জ্জনের পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত খরচে লোক, যাহা কিছু পাইয়াছেন সঞ্চয় মাত্র না করিয়া সব উড়াইয়া দিয়াছেন। সেই খরচ হইতে সতীশবাবুর কাছে কিছু কিছু করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াও দুই হাজার টাকা জমাইয়াছিলেন,—সেই টাকা যে এমনভাবে যাইবে তাহা কাত্যায়ণীও ভাবেন নাই।

উৎসা মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারে। সে ছেলেমানুষ নয়, পনের-ষোল বৎসর বয়স তাহার হইয়াছে। এ বয়সে ছেলেরা যতখানি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারে, মেয়েরা ততখানি করে এবং দরিদ্রের ঘরের মেয়েরা বেশী রকমই পারে। উৎসা বুঝিয়াছিল তাহার জন্য মা'কে বড় কম জালা সহ্য করিতে হইতেছে না; দিনরাত্রি দুর্ভাবনায় তিনি শুকাইয়া উঠিতেছেন।

উৎসা কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না।

সতীশবাবু গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া সে একবার ভাবিয়াছিল— নিজে গিয়া তাঁহার কাছে যাইবে, কিন্তু কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ে;—যে তাহার মা'কে এমন অপমান করিয়া তাড়াইয়াছে, তাহার নিকট আবার সে গিয়া দাঁড়াইবে! ঘৃণায় উৎসার হৃদয় ভরিয়া উঠে।

কাত্যায়ণীর সম্পর্কীয় এক ভ্রাতা কলিকাতায় বেশ ভাল কাজ করিতেন, তিনি ভগ্নীকে প্রতি মাসে আট টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন এবং ইহারই জন্য কাত্যায়ণীকে আজও উদরান্নের দায়ে পরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই।

যেদিন গ্রামের কয়েকজন হিতৈষিণী বাড়ী বহিয়া আসিয়া কাত্যায়ণীকে বেশ কতকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়া গেলেন, সেদিন নেহাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল বলিয়াই কাত্যায়ণী তাঁহার সেই সম্পর্কীয় ভ্রাতাকে উৎসার বিবাহের জন্য অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি পত্র দিলেন।

দিন তিন-চার পরে তাহার উত্তর আসিল। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, তিনি পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া অতিকষ্টে আট টাকা করিয়া ভগ্নীকে সাহায্য করিতেছেন, ইহার বেশী করা তাঁহার সাধ্যাতিরিক্ত। তিনি নিজে ছা-পোষা লোক, নিজের সংসার আছে, কন্যাদায় আছে, পরের কন্যার বিবাহের দায়িত্ব মাথায় লইবার দুঃসাহস তাঁহার নেই।

তিনি যে এইরূপই কিছু লিখিবেন, সে জানা কথা ; তথাপি কাত্যায়ণী লিখিয়াছিলেন ; কারণ মানুষ ডুবিতে বসিয়াও একটা কুটা আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়।

উৎসা পত্রখানা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তুলিয়া লইল। এক পলকের দৃষ্টি তাহার উপর বুলাইয়া লইয়া ভর্ৎসনার-স্বরে বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ মা, যাকে না তাকে এ রকম করে লিখছো কেন? মামা তোমায় যে আট টাকা করে সাহায্য করছেন, এই তাঁর অশেষ দয়া, এর উপর আবার চেয়ে তাঁকে বিব্রত করছো, সে দয়াটুকু পর্য্যন্ত শুকিয়ে নিচ্ছ।"

হতাশভাবে মা বলিলেন, "পাগল আমি হতে বসেছি উৎসা! তোর এত বয়স হল এখনও বিয়ে দিতে পারলুম না—"

বাধা দিয়া উৎসা বলিল, "হলই বা বয়েস, তাতে কি?"

কাত্যায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "হলই বা বয়েস—এ কথা বললে

কি হিন্দুর ঘরে চলে উৎসা! বিয়ে দিতেই হবে। পনর বছর বয়স হয়ে গেল—"

উৎসা বলিল, "শুনেছি, অনেক মেয়ে মোটে বিয়েই করে না, তাদের তো কিছুই হয়নি মা!

কাত্যায়ণী বলিলেন, "সহরে চললেও গাঁয়ের লোক সে কথা মানবে কেন মা! তারা শুনবেই বা কেন? দেশে-ঘরে থাকলে এত বড় মেয়ের বিয়ে না দিলে যে একঘরে হতে হবে। শুনলি নে সে দিন,— ও-পাড়ার জেলে-মাগীরা এসে কত কথা বলে গেল। জনে জনে কথা শুনিয়ে যাচ্ছে..."

উৎসা চুপ করিয়া রহিল।

জনে জনে যে কত কথা শুনাইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারও অজ্ঞাত নাই। উৎসা নিজে দুপুর ছাড়া ঘাটে যাইতে পারে না, লোকের কথা শুনিয়া তাহাদের মুখ দেখিতে তাহার ঘৃণা হয়।

একটা হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "যাক্ এখন ওসব কথা, তুমি ততক্ষণ একটু বস মা, আমি এই বেলা ঘাট হতে এক কলসী জল নিয়ে আসি।"

কাত্যায়ণী বলিলেন, "এখন থাক্ না মা,—খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ও বেলায় আন্‌লে হবে এখন।"

"এই বেলা কেউ ঘাটে থাকে না, এই সময়ই নিয়ে আসি—"

বলিয়া উৎসা প্রকাণ্ড বড় একটা মাটির কলসী লইয়া চলিয়া গেল; কাত্যায়ণী বারাণ্ডায় খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

আজ কয়টা বৎসর ঘরের চালা কোনরকমে টিঁকিয়া আছে, এ-বৎসর চালা না বদলাইলে চলিবে না, খুঁটি বদলাইতে হইবে, দেওয়াল সারিতে হইবে, এ-সব করিতে অনেক টাকার দরকার, এত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? মাথা গুঁজিবার স্থানটা তো আগে চাই! কিন্তু চুলোয় যাক্ মাথা গুঁজিবার স্থান—উদরের অন্ন—পরণের কাপড় —আগে চাই উৎসার বিবাহ। তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া কাত্যায়ণী গাছতলায় বাস করিবেন—লোকের বাড়ী এতটুকু আশ্রয় লইয়া থাকিবেন—সেও ভাল।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে জলভরা কলসী লইয়া আসিতে ঠিক দরজার কাছে উৎসা চৌকাঠ বাধিয়া সশব্দে পড়িয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে কলসীটা শতধা হইয়া গেল।

কাত্যায়ণী নিজের ভাবনা ভুলিয়া গেলেন, ছুটিয়া গিয়া উৎসাকে টানিয়া তুলিলেন;—"আঃ, আমার পোড়া কপাল রে! বললাম, কলসী এখন থাক, বিকেলের দিকে আনলে চলবে এখন,—কথা তো শুনলি নে! একি হাতখানা বডড কেটে গেল যে! ...দেখি....দেখি—"

উৎসা কাপড় দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল; বলিল, "ও একটুখানি কেটেছে, এখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।"

কাত্যায়ণী জোর করিয়া তাহার হাতখানা বাহির করিয়া দেখিলেন; তাঁহার চোখে জল আসিতেছিল, বলিলেন, "দাঁড়া খানিকটা রান্নাঘরের ঝুল দিয়ে বেঁধে দেই, এখনি রক্তটা বন্ধ হয়ে যাবে এখন; বড় রক্ত পড়ছে।"

উৎসাকে তিনি রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসাইয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন

"ও মা দরজার কাছে এত রক্ত কেন গা, বৌমা! রক্তে যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে গো—!"

সম্পর্কীয়া পিস-শাশুড়ী দরজার উপরেই দাঁড়াইলেন।

কাত্যায়ণী চোখ মুছিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মেয়েটা পড়ে গেছে পিসি-মা! হাত কেটে গেছে কিনা, ও সেই রক্ত। বড্ড বেশী কেটে গেছে—রক্তও পড়েছে তাই খুব বেশী।"

পিসি-মা অতি সন্তর্পণে রক্ত ডিঙ্গাইয়া নিকটে আসিলেন। বলিলেন, "কি দিয়ে বেঁধে দিলে—রান্নাঘরের ঝুল বুঝি?...ওর চেয়ে লঙ্কা-বাটা দিয়ে বাঁধলে হতো; জ্বালা ধরে এখনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যেতো।"

বিকৃতমুখে উৎসা বলিল, "জ্বালা এতেই যথেষ্ট ধরেছে, লঙ্কা-বাটার জ্বালায় আর দরকার নেই ঠাকুর-মা!"

অপ্রসন্নমুখে পিসি-মা বলিলেন, "ওই শোন কথা! কথা বলছি তোমার মায়ের সঙ্গে, তোমায় উত্তর দিতে কে বলেছে বাছা! আমি তো তোমার কাছে শুনতে চাইনি। এই যে বদ্-অভ্যাসটি এইটি ছাড়িয়ো বউ-মা, নচেৎ এ মেয়েকে নিয়ে ভুগতে হবে বড় কম নয়। বিয়ে তো দিতেই হবে, এরপর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যে যার তার সঙ্গে এই রকম ট্যাক্ ট্যাক্ করে কথা বলবে, সেটি তো ভাল নয়, এরপর যে পিতৃপুরুষ উদ্ধার করবে দিনরাত!"

উৎসা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কাত্যায়ণী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "বদ্-অভ্যাস ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করছি পিসিমা! বিয়ে হলেই সব সেরে যাবে।"

পিসি-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের কথা হচ্ছে নাকি?"

কাত্যায়ণী বলিলেন, "কোথায় !...এমন পোড়াকপাল যে, কোথাও বিয়ের ঠিক হচ্ছে না পিসি-মা ! কি কপালই যে করেছি—"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিয়ে হবেই বা কি—পয়সা যদি থাকতো মেয়ের বিয়ে আটকে থাকতো না—এতদিন কবে বিয়ে হয়ে যেতো। একটি পয়সা নেই, কে গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে বল ?"

তিনি অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পিসি-মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাই বলে কি মেয়ের বিয়ে দেবে না, বউ-মা ? বলি,—গরীব-দুঃখীর মেয়ের জন্যে গরীব-বরও তো পাওয়া যায়—"

বাধা দিয়া কাত্যায়ণী বলিলেন, "বিনা পয়সায় তারাও চায় না পিসি-মা, তারাও পেতে চায়। গরীবের কন্যাদায় উদ্ধার করবার ইচ্ছে কয়জনের আছে এ দেশে ?"

উৎসা উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, এসব কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

*　　*

*

পথ চলিতে সরিতের সঙ্গে হঠাৎ যে লোকটির সহিত দেখা হইয়া গেল, তাঁহাকে দেখিবার আশা সে মোটেই করে নাই।

আনন্দ মিত্র যদিও গ্রামের জমিদার ছিলেন, তথাপি তিনি গ্রামের একেবারে অপরিচিত লোক ছিলেন বলিলেও হয়। কলিকাতায় তিনি থাকিতেন, মাঝে মাঝে গ্রামে আসিলেও গ্রামের লোকের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

সম্প্রতি তিনি গ্রামে ফিরিয়াছেন—সঙ্গে আসিয়াছে তাঁহার একমাত্র কন্যা মৃণাল।

সম্প্রতি থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে; কলেজের ছুটি হওয়ায় এবার পিতাকে সে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে।

পিতা সংসারে থাকিয়াও সংসারে অনাসক্ত; পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেও চলে। তাঁহার দিন-রাত গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি লইয়া কাটিয়া যাইত।

ম্যানেজার বিষয়কার্য্যের জন্য জমিদারের নিকটে গিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, আনন্দবাবু কোন কিছুতেই কাণ দেন না। এখন মৃণাল অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছে, পিতার কাজ-কর্ম্ম আজ-কাল সেই সব করিয়া দেয়।

এবার সে জোর করিয়া গ্রামে আসিয়াছে; গ্রামের ও গ্রামবাসীর অবস্থা সে স্বচক্ষে দেখিতে চায়। আনন্দবাবুকেও নিস্তব্ধ গৃহ-কোণ হইতে টানিয়া আনিয়াছে,—পিতার সাহায্যে সে সকলের সহিত পরিচিতা হইতে চায়—সকলের পরিচয় পাইতে চায়।

কলিকাতায় সরিতের সহিত তাহাদের পরিচয় হয়।

প্রিয়দর্শন এই যুবকটি অতি সহজেই আনন্দবাবুর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল;—মৃণালের সহিতও তাহার পরিচয় হইয়াছিল।

সেদিন গ্রামের পথে সরিতকে দেখিয়া মৃণাল আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে বাবা, মিঃ বোসও এখানে এসেছেন—"

আনন্দবাবু হাতের মোটা লাঠিটার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়পূর্ণ দুইটি চোখের দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "তাই তো, সরিত যে—এখানে তুমি!—মানে…?"

সরিত নিকটে আসিয়া স্মিত-মুখে হাসিল; নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনারা আস্‌তে পারেন, আমি আস্‌তে পারিনে কি?"

মৃণাল বলিল, "এ যে আমাদের নিজের দেশ—"

সরিত বলিল, "আমারও নিজের দেশ—"

আত্মবিস্মৃত আনন্দবাবু লাঠিটা তুলিয়া বগলে রাখিলেন; "এখানে তোমার নিজের দেশ!—মানে…?"

সরিত বলিল, "মানে, আমি আপনারই প্রজা—সতীশ বোসের ছেলে—"

"সতীশ বোসের ছেলে!...এঁ্যা,—তুমি আমাদের সতীশ বোসের ছেলে—!...কই, সে কথাটা তো এতদিন বলনি বাপ্—?"

আনন্দে উৎফুল্ল আনন্দবাবুর বগল হইতে লাঠিটা পড়িয়া গেল! তিনি দুই পা আগাইয়া আসিয়া সরিতের স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন; "আরে এ-কথাটা আগে বলতে হয়! সতীশ বোস আমার বন্ধু,—তার ছেলে তুমি, তুমি যে আমার ঘরের ছেলে, তোমার সঙ্গে কার কথা! ছিঃ, ছিঃ, এতবড় কথাটা তুমি লুকিয়ে রেখেছো বাপু!"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল, "কই—না, আমি লুকাইনি তো। আপনি সে সব কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি, আমারও বলবার দরকার হয়নি।"

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা আপনার পরিচয় পাইনি, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয় পেয়েছিলেন?"

সুরিত হাসিল মাত্র।

মৃণাল বলিল, "দেখলে বাবা, মিঃ বোস সব জানেন, তবু উনি কিছুই বলেন নি। এটা কিন্তু আপনার খুবই অন্যায়! আপনি জেনে শুনে—"

সরিত বলিল, "এ অভিযোগটা বরং আনতে পারেন, কিন্তু দোহাই আপনার—আমাকে ঐ মিঃ বোস নামে ডাকবেন না, ও নামটা আমার একেবারে অসহ্য মনে হয়। এ-কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখবেন, আমি যে দাঁড়-কাক, সেই দাঁড়-কাকই আছি, ময়ূর আজও হতে পারিনি—তার জন্যে কোন চেষ্টাও করিনি।

আনন্দবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; —"শোন মা—শোন, আমাদের সরিতের কথা একবার শোন! ও-যে বিলেতে গেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পাশ করেছে, সে সব কথা কাউকে জানাতে চায় না। বেশ—বেশ, সত্যি আমার ভারী আনন্দ হল—এ কথা শুনে আর তোমায় দেখে। মিনু! কই, আমার লাঠিটা ?···আনিনি নাকি—?"

লাঠি যে সঙ্গে ছিল, পড়িয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন খেয়ালই নাই। মৃণাল হাসিয়া লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার হাতে দিল; বলিল, "বাবা যেন কি! এরপর কেউ তোমায় নিয়ে চলে গেলেও তো তুমি জানতে পারবে না···ওরকম ভুলো মন হলে কি চলে? একটু আত্মচিন্তা কর বাবা!"

"আত্মচিন্তা—আত্মচিন্তা—"

অন্যমনস্কের মত আনন্দবাবু বলিলেন, "হুঁ তা করি বই কি, অনেক বেশী করি—তোদের চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু ওসব কথা থাক; সরিত! তোমার বাবাও এসেছেন বোধ হয়, একবার দেখাটা করতে পারলে হ'তো—"

সরিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাবা এসেছেন বই কি! আমি আজই বলব তাঁকে,—সঙ্গে করে আপনার কাছে নিয়ে যাব এখন। আপনি এসেছেন শুনলেই তিনি আসবেন! তাঁর অবস্থাও ভারি কাহিল কিনা, সতের আঠারো বছর গ্রামে না থাকায় সব অচেনা হয়ে গেছে; আর গ্রামে কারও সঙ্গে মিশতে পারছেন না।"

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর এতদিন না আসার কারণটা কি?"

সরিত উত্তর দিল, "ব্যবসা ;—প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ধনী না হয়ে আসবেন না ; এই হচ্ছে কারণ।"

আনন্দবাবু মাথা দুলাইলেন ;—হুঁ, পুরুষের পণ বটে,—মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছে। তবে তোমার বাবাকে নিয়ে এস সরিত কিন্তু—"

বলিতে বলিতে তিনি হাসিলেন,—"কথাটা হচ্ছে কি,—তোমার বাবা এখন ধনী, যদি না আসেন ? তার চেয়ে চল না মিনু, আমরাই দেখা করে আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথা বলে যাই।

সরিতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "ধনী হলেও মনে হয়, বাবা বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখবেন।"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। মনে পড়িল, বিনয়ের কথা—হরেন কাকার কথা।

একদিন তিনিও তাহার পিতার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সে বন্ধুত্বের যাচাই হইল—সামান্য দুই হাজার টাকা মূল্যে ! ঠিক—

কিন্তু এ ঠিক কাহাকে ?...পিতাকে, না সেই পরম বন্ধু হরেন কাকাকে ?

মুহূর্ত্তে সরিত সচেতন হইয়া উঠিল।

মৃণাল বলিল, "সরিতবাবু যখন কথা দিচ্ছেন, তখন নিয়ে যাবেনই ওঁর বাবাকে ; অনর্থক তুমি আর কেন যাবে বাবা ! তুমি অনেকটা হেঁটেছ আর বেশী হেঁটে দরকার নেই। একে বাতের শরীর, আবার বেশী বাড়বে—।"

সরিতের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "নমস্কার সরিতবাবু! নিয়ে আসবেন আপনার বাবাকে—আমরা প্রতীক্ষায় থাকব...।"

সে পিতাকে লইয়া অগ্রসর হইল।

যতক্ষণ দেখা যায়, সরিত সেখানে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া রহিল। গ্রাম্য-পথের একটা বাঁকের আড়ালে পিতা-পুত্রী মিলাইয়া গেল,—সরিত ফিরিল।

বেশ মেয়েটি! শিক্ষা আছে, সভ্যতাও আছে; জড়-সড় সঙ্কোচভাব নাই।

সরিত অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিল।

একটা বাঁক ফিরিতেই সে হুড়-মুড় করিয়া একজনের ঘাড়ের উপর পড়িল; অপ্রস্তুতভাবে পিছনে সরিয়া আসিয়া দেখিল, সে যাহার উপরে গিয়া পড়িয়াছে, সে গ্রামেরই অন্ধ বাউল-গায়ক সুদাম।

"বেচারা!"

অন্যমনস্কতার জন্য সরিত নিজের উপর নিজেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। হাত ধরিয়া সুদামকে উঠাইয়া দিতে দিতে কোমলকণ্ঠে সে বলিল, "বড্ড লেগে গেছে সুদাম! কোথায় লাগলো?"

সুদাম হাত বুলাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "না ছোটবাবু লাগেনি কোথাও,—আপনারই হয় তো লেগেছে।"

গরীব লোকেরা তাহাই মনে করে বটে, নিজেদের দেহের বেদনার অনুভূতিও যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

সরিত বলিল, "না আমার লাগেনি সুদাম, আমি তো পড়িনি তোমাকেই ফেলে দিয়েছি।"

পকেট হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া সে স্বদামের
গেল, সুদাম চমকাইয়া পিছু সরিয়া গেল—"ছিঃ-ছিঃ কচ্চে করছেন ছোটবাবু! আপনাদেরই খেয়ে-পরে আমরা সাতপুরুষে মানুষ, আপনি এখন—

বাধা দিয়া সরিত বলিল, "তা হোক না সুদাম, এ আমি দিচ্ছি, বাবা বা মা তো দিচ্ছেন না।"

সুদাম অগত্যা হাত পাতিয়া আধুলিটি লইল।

সরিত বলিল, "এমন করে একা একা পথে বেরিয়ো না, পাড়াগাঁয়ের পথে-ঘাটে সাপও বেরোয়, দুষ্ট গরুও চরে; একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ লাগে।"

সুদাম বলিল, "লতিটা সঙ্গে ছিল বাবু, আর একটা ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারামারি করতে ছুটেছে; আমায় যে একলা ফেলে গেছে, সে হুঁস তার নেই।"

সরিত বলিল, "চল, আমি তোমায় পৌছে দিয়ে আসি; এই তো কাছেই তোমার বাড়ী।"

অন্ধ সুদাম সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল;—"না—না, ছোটবাবু, আপনি আপনার কাজে যান, আমি একাই যেতে পারব। এই কাছেই বাড়ী, লাঠি ধ'রে চলা ফেরা আমার বেশ অভ্যাস হ'য়ে গেছে।"

কিন্তু সরিত তাহাকে একা ছাড়িল না, তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

সরিতের

আসবে

*   *

*

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। শেষ দিনের অস্তপ্রায় সূর্য্যের লাল আলো সমস্ত গ্রামের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; যাহা-কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই রঙিন করিয়া তুলিয়াছেন।

মৃণাল খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। নীচে প্রকাণ্ড বড় বাগান, বড় বড় নারিকেল, সুপারি, তাল প্রভৃতি গাছগুলি আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝখানে মস্তবড় পুষ্করিণী, কালো জলে বাতাসের ক্ষীণ স্রোত উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর চারিধারে বেল, যুঁই, জবা প্রভৃতি ফুলের গাছ ;—সময়ে ফুল ফুটিয়া সারা বাগানটা আলো করিয়া দেয়।

বাগানের তারের বেড়ার ওধারে গ্রামের পথ। মানুষ জন অহোরাত্র এই পথে যাতায়াত করে ; প্রচুর ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী চলে,— ধূলি-ধূসরিত দেহে গাড়োয়ান গ্রাম্য-স্বরে গান গাহিয়া যায় ;—মাঝে মাঝে অবাধ্য গরুর পিঠে পাঁচনের আঘাত করিয়া চিৎকার করে— "হ্যাদে, ডাইনে চল্, বাঁ-য়ে যা—।"

গ্রামের মেয়েরা একজন দু'জন করিয়া বা দল বাঁধিয়া কলসী কক্ষে গঙ্গায় যায়—স্নানান্তে আবার ফিরে। বধূরা অবগুণ্ঠন তুলিয়া চকিতে চারিদিকে দেখিয়া লইয়া আবার মুখ ঢাকে; তাহাদের হাতের কাঁচের চুড়ী ঝিন্ ঝিন্ শব্দ তোলে—কলসীর জল ছলাৎ ছলাৎ করে।

দুপুরে যখন গ্রামের সবাই ঘুমায়, অশান্ত ছেলে-মেয়েরা তখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসে;—পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; গৃহস্থের বাগানের আম, জাম, পেয়ারা ধ্বংস করে। তাহারা পুষ্করিণীতে সাঁতার কাটে, জল ছড়ায় তাল-বেতাল গান করে আবার ঝগড়াও চালায়—মারামারিও করে।

এ সব দেখিতে মৃণালের বড় ভাল লাগে। সহরে থাকিয়া গ্রামের কথা বই-তে পড়িয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, তাই এবার সে নিজের গ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে আসিয়াছে,—পিতাকেও জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

দাসী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। মৃণালের তন্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়া সে তাহাকে ডাকিতে সাহস করিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সে যখন দেখিল মৃণাল ফিরিল না, তখন দরজাটা একটু ঠেলিয়া দিয়া শব্দ করিল।

সেই শব্দে চমকিয়া উঠিয়া মৃণাল পিছন ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই—কোন দরকার আছে?"

দাসী বলিল, "বাবু ডাকছেন;—বললেন, এখনই আপনাকে দরকার। একবার আসুন!"

মৃণাল বলিল, "তুমি যাও আমি যাচ্ছি।"

সোনার সংসার

আনন্দবাবু গঙ্গার ধারের বারাণ্ডায় একখানা ইজি-চেয়ারে একা বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার তখন গ্রামের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, গঙ্গা-বক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ওপারে কুটীরে কুটীরে আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে ;—সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

শান্ত গঙ্গা-বক্ষে দুই একখানা নৌকা চলিয়াছে, জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে কোন একখানা নৌকায় কে গান ধরিয়াছে—

'মন-মাঝি, তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পার্‌লাম না।'

আনন্দবাবুর দুই চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছিল, সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনেও সুর উঠিয়াছিল—

'আমি আর বাইতে পার্‌লাম না—'

"বাবা, আমায় ডাক্‌ছো—?"

মৃণাল যে একেবারে চেয়ারের পার্শ্বে আ[illegible] দাঁড়াইয়াছে, তাহা আনন্দবাবু জানিতে পারেন নাই। মনের সুর অকস্মাৎ কাটিয়া গেল, তিনি সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিলেন।

বলিলেন, "ডাকছিলাম তো,—তুই কি করছিলি মা? একা এখানে বসে আর ভাল লাগছিল না, এর চেয়ে—"

মৃণাল চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এর চেয়ে কলকাতায় থাক্‌লে ভালো হতো, না—?"

আনন্দবাবু যেন বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়, তবে বড় একা কিনা ;—আর এখানে থাকতে আমার মোটে

ভাল লাগে না মিনু! এই হচ্ছে আমার আসল কথা। অথচ একদিন জানিস্ মিনু, এই গ্রামই আমার এত ভাল লাগত—"

সে কথা মিনু জানে। সে গল্প শুনিয়াছে।

মা ছিলেন গ্রামের মেয়ে—গ্রামের বধূ। কলিকাতায় স্বামীর সঙ্গে একবার ভবানীপুরের বাড়ীতে গিয়া তিনি পাঁচদিন টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। কোন ক্রমে গ্রামে আসিয়া পড়িয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "মা-গো, কলকাতায় নাকি মানুষ থাকে। কেবল বাড়ীর প'রে বাড়ী দাঁড়িয়ে, আকাশ দেখা যায় ফালির মত, না পাওয়া যায় এমন ফাঁকা বাতাস, এমন খোলা আলো। লোকে যে কি কর্‌তে কলকাতায় গিয়ে বাস করে, তা জানিনে।"

আনন্দবাবু জমিদার হইলেও গ্রামের পাঁচজনের একজন ছিলেন। গ্রামবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক যোগ—এই গ্রামকে তিনিও বড় ভালবাসিতেন। মাঝে মাঝে কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইলেও তিনি দু-চার দিনের বেশী—কলিকাতায় থাকিতে পারিতেন না।

পত্নীর মৃত্যুর পর, শিশু-কন্যাকে লইয়া সেই যে তিনি গ্রাম ছাড়িয়াছেন—আর একটি দিনের জন্যও আসেন নাই। প্রজাদের শত অভাব-অভিযোগ কলিকাতায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে, তিনি ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন,—সংসারের কোন ব্যাপারে লিপ্ত হইতে চান নাই।

বহুকাল পরে গ্রামে ফিরিতে দৃষ্টি পড়িয়াছে অদূরে গঙ্গাতীরস্থ সেই বকুল গাছটির তলে।

ঐ বকুলতলায় তাঁহার পত্নীর সৎকার হইয়াছে। এতকাল প
সে দিনের কথা নূতন হইয়া মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

মৃণাল নিঃশব্দে তাঁহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দি
বুঝিতে পারিল, পিতার চক্ষু শুষ্ক নয়—আর্দ্র। অন্ধকার বারাণ্ড
তাঁহার চোখ মুখ দেখা যাইতেছিল না, হাত দিয়া মৃণাল বুঝিল
বলিল, "এখানে এই অন্ধকারে তুমি যে একা বসে আছ বাবা, তা তে
কেউ জানে না ; এই মাত্র দু'-তিনজন তোমার সন্ধানে এসেছিলেন
আমার কাছে খবর যেতে তুমি বাড়ী নেই ভেবে, আমি তাঁদে
বিদায় দিয়েছি।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দবাবু বলিলেন, "সে বেশই করেছিস্
কারও সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার এখন নেই ; তার চে
এমনি অন্ধকারে একা বসে থাকতে আমার ভাল লাগে। তুই বর
একখানা গান কর না মিনু, সেই মাঝির গানটা—"

"মাঝির গান—?"

মৃণাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওই যে গানটা নৌকায়
গাচ্ছে, সেইটা ?"

আনন্দবাবু বললেন, "না—না, সেই যে—'তরী হেথা বাঁধবো
নাকো—"

"ও", বলিয়া মৃণাল চুপ করিয়া গেল।

অন্ধকারে প্রায় বিলীয়মান অদূরস্থিত বকুল গাছটার দিকে সে
তাকাইল।

ভৃত্য মৃণালের আদেশে আলো দিয়া গেল।

পিতার আদেশে মৃণাল অর্গান লইয়া বসিল ; গাহিল—

ওগো মাঝি,

তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে,
ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদীর মাঝে।

আনন্দবাবু নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। মৃণাল গাহিতে লাগিল—

এই নদীর এই ঘাটেতে
এমনি সাজে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসীটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।

গ্রামের মেয়েরা কলসীকক্ষে নদীর ঘাটে যাওয়া-আসা করে। দীর্ঘদিন আগে যে বধূটি এই ঘাটে যাওয়া-আসা করিত, তাহার পায়ের চিহ্ন অনেক পায়ের চিহ্নের মাঝে কোথায় মিলাইয়া গেছে কে জানে।

মৃণাল গাহিতে লাগিল—

ওই নদীর ওই ঘাটের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে ;
এখনও সেই চিতার প'রে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
সরল মধুর মুখখানি তার
বাধা দেয় যে সকল কাজে।

গান থামিয়া গেল ; মৃণাল পিতার পানে তাকাইল।

শূন্য-দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া আছেন দূরের পানে,—যেদিক হইতে নদী-স্রোতের অতি মধুর কুল কুল শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, ফুটন্ত বকুলের মিষ্ট-গন্ধ বাতাস বহিয়া আনিতেছিল।

ভোরের আলো যখন ধরণীর মুখে চুম্বন দিবে, তখন বকুল ঝরিয়া তলা বিছাইবে—তখনও গন্ধ ছুটিবে।

মৃণাল মুখ ফিরাইয়া চোখের প্রবহমান জলধারা মুছিয়া ফেলিল।

মেয়ের দিকে তাকাইয়া কাত্যায়ণীর দিনে আহার নাই—রাত্রে নিদ্রা নাই।

পাড়ায় তো প্রায় মুখ দেখাইবার যো নাই। উৎসা বাহির হইতে চায় না, কাত্যায়ণী বাহিরের সব কাজ করেন।

দিন যত যায় বয়সও তত বাড়ে—কাত্যায়ণীরও অশান্তি বাড়ে।

পাড়ার জগন্নাথের মা সেদিন বলিল, "এত ভাবছো কেন গা দিদি, ছেলের আবার ভাবনা? ঐ ভশ্চায পাড়ার রামধন ঘোষের ছেলে গো—সে ছেলে কলকাতায় কলেজে পড়ে, তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের কথাটা তোল না কেন। ঘোষ তোমার স্বামীর খুব বন্ধু ছিল শুনেছি, তোমার মেয়েকে নিশ্চয়ই নেবে।"

তাইতো—এ কথাটা কাত্যায়ণীর মনে হয় নাই; ঘোষ মহাশয় সত্যই তাঁহার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন,—সেদিনকার কথা মনে করিয়াও কি আজ তিনি এই উপকারটা করিবেন না?…

ঘোষ মহাশয়ের অবস্থা বেশ ভাল; যেমন তেমন করিয়া মোটা ভাত, মোটা কাপড় জুটাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। পাঁচ ছয়টি মেয়ের পরে এই একটি মাত্র ছেলে, কাজেই তাহার আদরের শেষ ছিল না।

অভয় কলিকাতায় কোন কলেজে আই-এ পড়ে, দু'বার ফেল

করিয়াও সে পড়া ছাড়ে নাই। ছুটিতে বাড়ী আসে এবং মস্ত বড় বড় কথা বলিয়া সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। তাহার আকৃতি প্রকৃতি সে সম্পূর্ণ বদলাইয়া লইয়াছে। এখন তাহাকে দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারে না, এ সেই অভয়—সেই পল্লীগ্রামের ছেলে অভয়।

ঘোষ-পরিবারের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা কাত্যায়ণী জানেন না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই আশা করিয়াছিলেন—অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ রাজকন্যা তাঁহাদের গৃহে আসিবে; সে রাজকন্যাও হইবে অপূর্ব্ব সুন্দরী—ঘর আলো করা হইবে তাহার রূপ। পাঁচটি মেয়ের বিবাহ দিতে ঘোষ মহাশয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, একটি ছেলের বিবাহ দিয়া তিনি তাহা পোষাইয়া লইতে চাহেন।

সেদিন দুপুরবেলা মনের মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া 'দুর্গা-দুর্গা' বলিয়া কাত্যায়ণী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। শেষ বৈশাখের রৌদ্র যেন ঝলসিয়া পড়িতেছে—পথে পা দেওয়া যায় না। কাত্যায়ণী পথ ছাড়িয়া পথের পার্শ্বস্থিত শুষ্কপ্রায় ঘাসের উপর পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী তখনও নীরব হয় নাই; মেয়েরা তখনও আহারাদি সারিতেছিলেন। ঘোষ মহাশয় নিজের গৃহে ঘুমাইতেছেন। গরমের বন্ধে দু'তিনটি বন্ধু সঙ্গে লইয়া অভয় বাড়ী আসিয়াছে; কাজেই বাড়ী এখন গুল্‌জার। বড় ঘরটায় তাহারা মহানন্দে তাস খেলা সুরু করিয়াছে; তাহাদের চীৎকারে, গানে সমস্ত বাড়ী শব্দায়িত।

কাত্যায়ণী রন্ধনগৃহের দরজার কাছে বসিলেন এবং অঞ্চল হইতে একটু আচার খুলিয়া দরজার উপর রাখিলেন।

লুব্ধা একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "ও কি মাসী-মা ?"

কাত্যায়ণী বলিলেন, "ও একটুখানি আচার; বাছা অভয় অনেককাল পরে কলিকাতা হতে বাড়ী ফিরেছে—ছোটবেলায় সে আচার খেতে বড় ভালোবাসতো, তাই তার জন্য ওইটুকু আনলাম।

গৃহিণী হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া আচারখানি তুলিয়া লইলেন; হাসিমুখে বলিলেন, "তা বেশ করেছ ভাই, অভয় আমার আজই সবে আচারের কথা বলেছিল। আমার এমনি পোড়া-কপাল যে, অন্য বছর কত না আচার তৈরী করেছি, এ-বছর তেমনি কিছু করতে পারিনি। সেখানে কি কিছু খেতে পায় ভাই! সেই বোর্ডিংয়ে একঘেয়ে ভাত, ডাল আর একটা তরকারী, যেমন ডাল—তেমনি তরকারী; ওরা কি তা কিছু খেতে পারে—না, ওদের অভ্যাস আছে? বাছা যখন বাড়ী আসে, তখন অস্থিচর্ম্মসার চেহারা নিয়ে; দু'দিন বাড়ীতে থেকে—বলতে নাই, চেহারাটা তবুও ফেরে। এই আচারটুকু খেয়ে সে যে কি খুসি হবে, তা বলতে পারিনি।"

কাত্যায়ণী ভালভাবে জাঁকিয়া বসিলেন।

উনানের উপর তরকারী পুড়িয়া উঠিতেছিল, গৃহিণী তাড়াতাড়ি তরকারী নাড়িতে বসিলেন। কন্যা গেনি তাহার কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছিল; জিজ্ঞাসা করিল,—"উৎসা কি করছে গো, কাকি-মা!"

কাত্যায়ণী উত্তর দিলেন, "ঘরে বসে কি একটা বুনছে দেখলাম।"

গেনি বলিল, "তাকে নিয়ে এলেন না যে ?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাত্যায়ণী বলিলেন, "না, সে আর বার

হয় না বাড়ী হতে। আর বার হবেই বা কি মা, গাঁয়ের লোক যা স
কথা বলে, তাতে না বার হওয়াই ভাল।"

গৃহিণী তরকারীতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তাও বা
ভাই, মেয়ে বড় হয়ে গেছে, এখন আর বিয়ে না দিলে কি মানায়? তা
বিয়ের কি করছো—কোথাও সম্বন্ধ-টম্বন্ধ হচ্ছে না কি?"

কাত্যায়ণী আবার দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলিলেন; বলিলেন, "গরীবে
মেয়ের আবার বয়েস—তার আবার বিয়ে! এমন কোন্ ছেলে আছে
যে এই গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে!"

গেনি বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কেন, উৎসা তো খুব সুন্দরী
কাকি-মা! অমন মেয়ের পাত্র জুটছে না—বল কি!"

গৃহিণী বলিলেন, "যত কালপেঁচা মেয়েগুলোর পটাপট বিয়ে হয়ে
যাচ্ছে আর অমন মেয়ের বিয়ে হবে না—এও কি হতে পারে? অমন
সুন্দরী মেয়ে সকলেই লুফে নেবে যে; হাজারে অমন মেয়ে একটা দেখা
যায় না।"

কাত্যায়ণী মুহূর্ত্তমাত্র নীরব রহিলেন; তাহার পর হঠাৎ কি হইতেছে
বুঝিবার পূর্ব্বেই গৃহিণীর পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িলেন। তখন
সেখানে কেহই ছিল না; গেনি সেইমাত্র উঠিয়া গিয়াছিল।

"দিদি, আমার উৎসাকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি, ওবে
তুমি নাও, আমি বাঁচি—মুক্তি পাই! দুঃখিনী বিধবার এই উপকারটি
কর ভাই! দিদি, আমাকে এ দায় হতে মুক্তি দাও—"

ব্যাপারটা এমন অতর্কিত যে গৃহিণী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া
গেলেন। খানিকক্ষণ তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

কাত্যায়ণী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আজ তিনি থাকলে কি ভাবতাম দিদি, মেয়ে কি আমার এত বড় হতে পারতো? এতদিন কবে ওর বিয়ে হয়ে যেতো। ওর কপাল খারাপ, তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, আমাদের দুঃখেরও শেষ রইল না। পেটে না খেতে পাই, মাথা গুঁজবার জায়গা না থাক, আমি সব দুঃখ, সব কষ্ট সইব দিদি; —তুমি আমার উৎসাকে নাও,—আমি গাছতলায় পড়ে থাকব—ভিক্ষে করেও খাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলের বিয়ে দেওয়া তো আমার একার হাত নয় বোন! ওঁকে বলে দেখি, উনি যদি রাজি হন; আমার দিতে কতক্ষণ?"

কাত্যায়ণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বললেই উনি রাজি হবেন। আমি—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এ তোমার ভুল ধারণা ভাই, এ সব বিষয়ে আমাদের উনি যে তোমার কথা কাণে তুলবেন, তা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না। ওঁরা বলেন,—"মেয়েরা থাকবে রান্না করা আর ছেলেপুলে মানুষ করার কাজ নিয়ে, পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের কথা শুনবে কেন?"—তা যাই হোক, আমি বলব, একবার বলে দেখা বই তো নয়, তা আমি বলব এখন।"

তাঁহার কথার ভাবেই বোঝা যাইতেছিল—কেবল সুন্দরী মেয়ে হইলেই হবে না; অর্দ্ধেক রাজত্ব না হোক—হাজার পাঁচেকের আশা তিনি নিশ্চিতভাবেই করিয়া রাখিয়াছেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাত্যায়ণী উঠিলেন; বলিলেন, "মেয়েটা

একলা বাড়ীতে আছে, আমি এবার যাই। তুমি দেখো ভাই, ওঁকে বলে একবার চেষ্টা ক'রো! মেয়ে আমার শুধু সুন্দরী নয়, গৃহস্থের কাজ-কর্ম্ম যা কিছু বলবে, সে তাতে না বলবে না। আমার টাকাকড়ি নাই এই যা কষ্ট; নইলে—"

বলিতে বলিতে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। গেনি ফিরিয়া আসিল। "কি কথা হচ্ছে কাকি-মা—কিসের কষ্ট?"

কাত্যায়ণী উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী বলিলেন, "উৎসার বিয়ের কথা বল্‌ছেন,—যাতে অভয়ের সঙ্গে বিয়েটা হয়। আমার যদিও অমত নেই, তবুও উনি কি তাতে রাজি হবেন?"

গেনি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বাবা রাজি হলেও দাদা যে রাজি হবে না, এ আমি এক কলম লিখে দিতে পারি। দাদা তো সুন্দরী বউ চায় না, চায় শুধু টাকা,—টাকা না হলে দাদা বিয়েই করবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওই শোন ভাই! এ-কালের সব ছেলে, ওরা কি কারও কথা শোনে—না, রাখে? তার ওপর আমাদের অভয় কলিকাতায় থাকে—কলেজে পড়ে; ওর নিজেরই খরচ-পত্তর কত; বন্ধু-বান্ধব তো একটি-আধটি নয়, অমন কত শত বন্ধু ওর। বিয়েতে সবাইকে বলতে হবে সবাই আসবে আমোদ-আহ্লাদ করবে, সব ভার কি আমাদের এঁর ওপর দেওয়া চলে? আচ্ছা যাক্, তবু তুমি যখন ধরেছো, আমি বলে দেখব যাতে কাজটা হয়। আসল কথা কি জান, শুধু রূপ থাকলেই তো হয় না, রূপেয়াও থাকা চাই,.......তা হলেও আমি বলছি। দেখব চেষ্টা করে, তারপর তোমায় জানাব।"

কাত্যায়ণী বিদায় লইলেন।

* * *

উৎসা শুনিতে পাইল অভয়ের সহিত তাহার বিবাহের কথা হইতেছে।

'অভয়—!'

উৎসার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ খেলিয়া গেল। অভয়কে সে চেনে,—কেবল আকৃতিই নয়—তাহার প্রকৃতিও যে কিরূপ, সে পরিচয় উৎসা পাইয়াছে।

এই কয়েক দিন আগের কথা—

উৎসা সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে জল আনিতে গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিল। দুপুরে সেদিন যে জল তোলা হয় নাই, সে কথা মনে হয় নাই।

জলের কলসী লইয়া উঠিতে উঠিতে উপরে হাসির শব্দ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল—উপর দিকে তাকাইয়া দেখিল, বন্ধুগণসহ অভয় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

মাটির ঘাটে পা পিছলাইয়া যাইতেছিল, অভয় যে দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে, তাহা উৎসা মোটেই ভাবিতে পারে নাই। জলের কলসীটা দুই হাতে ধরিয়া অভয় মিষ্টকণ্ঠে বলিল,

"এ রকম সন্ধ্যে করে ঘাটে আসা তোমার উচিত হয়নি। চ
আমরাই সকলে মিলে তোমার কলসী বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাকুলকণ্ঠে উৎসা বলিল, "না দিন আমার কলসী, আপনাদে
নিয়ে যেতে হবে না।"

বন্ধুরা পরিহাস করিল—হাসিল; কুমারী কিশোরী সঙ্কোচে—ভ
মাটিতে মিশাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

অভয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; "আরে তাতে তোমা
এত লজ্জা কিসের বল দেখি? আমরা সবাই মিলে যদি তোমার কল
বয়ে নিয়ে যাই, কারোও ক্ষমতা হবে কোন কথা বল্‌বার? গাঁে
লোক বলুক দেখি আমার নামে একটী কথা—ঘরে আগুন লাগি
দেব!...একি পাড়াগেঁয়ে ভূত পেয়েছে—যা-তা বলে পার পাবে!"

বন্ধুরা সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—

ঠিক সেই সময় ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়া একজন—সে সরিত

মুহূর্ত্তমাত্র সে তাকাইয়া দেখিল।—অ সঙ্গীরা আস্তে আ
সরিয়া গেল, সরিতকে দেখিয়া তাহারা আর দাঁড়াইতে সাহস করি
না। অভয়ের কালো মুখখানা আরও কালো হইয়া উঠিল। সে-ও
একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া সাঁ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ব্যাপারটা কি বুঝিতে সরিতের একটুও বিলম্ব হয় নাই
অভয়কে সে পূর্ব্বেই চিনিয়াছিল—তাহার বন্ধুবর্গকেও চিনিে
পারিয়াছিল।

অভয় সরিয়া যাইতেই উৎসার দৃষ্টি উপরদিকে পড়িল, দেখিল-
সরিত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সরিত নীচে নামিয়া আসিল,—শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা, লে গেছে, তোমার আর ভয় নাই—বাড়ী যাও!"

বিবর্ণমুখে কম্পিতকণ্ঠে উৎসা বলিল, "না, ওরা এখনও যায়নি, থের মাঝে কোনও ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হয় তো দাঁড়িয়ে আছে, াবার আমায় যা না তাই বলবে।"

সেটা যে অসম্ভব নয় তাহা সরিতও জানে। বলিল, "তবে চল, ামি তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত দিয়ে আসি।"

সে অগ্রসর হইল, উৎসা তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

সেদিনকার কথা আজও উৎসার মনে হয়। সেই মুহূর্ত্তে সরিত দি উপস্থিত না হইত, তবে কি হইত?...

এ কথা মনে করিতে উৎসার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

অভয়কে সে যমের মত ভয় করে। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে অভয়কে স কালান্তক যমের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল—সে মূর্ত্তির কথা মনে করিতে াহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এ কথা সে মাকে বলিতে পারে নাই, মা ভাবিবেন। আর কানদিনই সন্ধ্যার সময় সে ঘাটে যায় নাই।

আজ মায়ের মুখে সে শুনিল, অভয়ের সহিত তাহার বিবাহের থা হইতেছে, তখন সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

যাহাকে সে ঘৃণা করে, তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে হইবে! ধাতার কি নির্দ্দয় ব্যবহার—নির্ম্মম বিচার!

সমস্ত দিন হাজার কাজের মধ্যে তাহার মনে কেবল সেই একটা থাই জাগিতে লাগিল, 'তাহার অভয়কে বিবাহ করিতে হইবে।'

যে অভয়কে সে সর্পের চেয়েও ভীষণ কুটিল, ব্যাঘ্রের চেয়েও বেশী হিং মনে করে. সেই অভয়ের স্ত্রীরূপে তাহারই গৃহে বাস করিতে হইবে!...

উৎসার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছিল।

আর তার শ্বাশুড়ী হইবে অভয়ের মা; যাহাকে দেখিলে উৎসা ভয় হয়। গ্রামের মধ্যে সকলেই অভয়ের মায়ের পরিচয় জানে- কেবল মেয়েরাই নয়, পুরুষেরা পর্য্যন্ত। সেদিন বৃদ্ধ তর্কপঞ্চান মহাশয় কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন।

অভয়ের ছোট ভাইটা তাঁহার কাছে পড়ে। একদিন কি অপরা তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাহার কানে ধরিয়া ঘরের বাহির করি দিয়াছিলেন। সেদিন তিনি জয়ীর গৌরব লাভ করিলেও পরের দিন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—যখন ঘাটের পথে অবগুন্ঠিতা রমণীটি তাঁহার নিকট কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন—কেন তিনি তাঁহার পুত্রকে কাণ ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন—সে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহার জন্য বৃদ্ধ তর্কপঞ্চানন তাহাকে এমন ভাবে শাস্তি দিতে পারেন—?

এই মেয়েটিই তাহার শ্বাশুড়ী হইবে—ইহা ভাবিতেই উৎসার জিহ্বা আমূল শুকাইয়া উঠিল।

কন্যার বিমর্ষ মুখ দেখিয়া জননী তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন; রাত্রে পার্শ্বে শায়িত কন্যার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলে আমি যে কি নিশ্চিন্তই হই, তা আর তোকে বলে কি জানাব উৎসা! লোকের কথা আর আমার সহ্য হয় না।"

উৎসা অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া রহিল।

কাত্যায়ণী তাহার মাথায় হাতখানা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'আমি জানি তুই কি ভাবছিস; কিন্তু কি করব মা, আমার যে কোন উপায় নেই! পাত্র দেশে ঢেরই আছে, কিন্তু দেখবে কে—আর গরীবের ঘরের মেয়েকে বিয়েই বা করবে কে? বাংলা দেশে এরকম প্রায়ই দেখা যায়; এদেশের মেয়েদের ভগবান যে দুঃখ-কষ্ট সইবার উপযুক্ত করেই পাঠান মা।...এ বাংলার মেয়ের অভিশাপ।"

রুদ্ধকণ্ঠে উৎসা বলিল, "বিয়ে যে করতেই হবে এমন কি কথা আছে মা? শুনেছি, অনেক মেয়ে আগেকার দিনে বিয়ে করেনি, তাতে তো তাদের জাত যায় নি?"

কাত্যায়ণী বলিলেন, "জাত যেত বৈকি মা, সে মেয়েকে কেউ কোন কাজেই নিত না; সেই জন্যেই তো গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গেও বিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। এক একজনের দেড়শো দু'শো স্ত্রীও থাকতো। বিয়ে না করে ক'জনই বা থাকতে পেরেছিল? যেমন করেই হোক্ কুমারী নাম খণ্ডন করতে হয়েছিল।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "পাত্র হিসাবে অভয় তো নেহাত মন্দও নয়। অবস্থা ভালো, বাপ-মায়ের একটি মাত্র ছেলে, লেখা-পড়াও শিখেছে; একটু আদুরে বলে অন্য রকম, তা ও-রকম হয়ে থাকে। গরীব মায়ের মেয়ে—শাশুড়ী ঝগড়াটে হলেও তোকে আদর-যত্নে রাখবে, ভাল খেতে-পরতে, দুখানা গয়না গায়ে দিতে পারবি। আমি কবে আছি, কবে নেই, আমার ভরসা করিসনে মা!"

উৎসা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল; একান্ত নির্ভয়ের স্থান-নিরাপদ জায়গা।

কাত্যায়ণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "জগতে কে কার আশ করতে পারে—কে কার মুখ চেয়ে থাকতে পারে মা! এই যে উনি সতীশবাবুব জন্যে কি না করলেন, কিন্তু এমনভাবে চলে গেলেন যে—"

তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না! মাতা ও কন্যার নীরব অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

*   *
*

উৎসার পরিচয় সরিত জানে।

উৎসার পিতা তাহাদের ব্যবসার জন্য কি করিয়াছেন, সে খবরও সে খ। যে তাহাদের মঙ্গলের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, আজ হারই স্ত্রী, কন্যা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়! মাথা গুঁজিবার নটুকু থাকিলেও কন্যার বিবাহ হয় না, সেজন্য তাহারা পথেও বাহির তে পারে না।

সরিতের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

পিতার কি উচিত ছিল না—এই দুস্থা মাতা ও কন্যাকে মাসিক কিছু রয়া সাহায্য করা,—উৎসার বিবাহ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা?

তিান বলিবেন—দেশের মধ্যে কাহার কি অবস্থা তিনি কি করিয়া নিবেন, কাহার দুঃখ তিনি দূর করিবেন।

সরিতের মতে, পিতা না জানিলেও তাঁহার খোঁজ করা উচিত ছিল।

সরিত জানে না, উৎসার পিতা উৎসারই জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া খিয়া গিয়াছিলেন, কাত্যায়ণী তাহা জানিয়া চাহিতে আসিয়াও পান ;, সতীশবাবু টাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন।

শনিবারের ছুটিতে বিনয় বাড়ী আসিল।

সে রাত্রিতে সরিতের সহিত দেখা হইল না, সকালেই বিনয় রতের সহিত দেখা করিতে আসিল।

"তারপর, মাছ ধরার ব্যাপারটা চলছে কি রকম—রোজ ক'টা ক মাছ ধরছো—?"

সরিত মাথা নাড়িল ; বলিল,—"কোথায় মাছ, মাছই ধরতে যাই —ভালো লাগে না !"

বিনয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "মানে,—এত বড় নেশা হঠাৎ এমন ভাবে ছেড়ে দিলে—এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা !—তোম এখানে থাকার প্রধান আকর্ষণ মাছ ধরা—এ কথা কে-ই বা জানে। সে দিকে বৈরাগ্য আসা—লক্ষণটা বড় সুবিধার ম হচ্ছে না।

সরিত হাতের বইখানা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল ; বলিল "বৈরাগ্য জাগে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে....শুধু নয়। দু'মাসের ছুটি তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো, ভাবছি আবার গিয়ে কাজে লাগতে হবে, মনে হতেও কি রকম ক্লান্তি আস্‌ছে—ভয় হচ্ছে।"

বিনয় গম্ভীরমুখে বলিল, "অন্যায় ভয়,—পুরুষমানুষ কাজের ভয় করবে কেন ? এখানে থাকার একটা আকর্ষণ আছে তা জানি, অন্ততঃ পক্ষে আনন্দবাবু যতদিন থাকবেন—"

সরিত বাধা দিল, বলিল, "আনন্দবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কিসের যে তিনি যতদিন থাকবেন ততদিন আমায় থাকতে হবে—?"

বিনয় একটু হাসিল, সে হাসির গভীর অর্থ ছিল এবং সে অর্থ সরিত বেশ বুঝিল। সে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এ তোমার ভুল ধারণা বিনয়! তুমি মনে করছো আনন্দবাবুর মেয়ে মৃণালের জন্যে আমি উপস্থিত এখানে রয়ে গেছি, যেদিন তাঁরা

যাবেন আমিও সেদিন গ্রাম ছাড়ব। কিন্তু সত্যি তা নয়, আমাকে এত হাল্কা মনে করো না।"

বিনয় বলিল, "অবশ্য আমি তা মনে করব না, কিন্তু সকলেই তা জানে কি না। গ্রামে এ বার্ত্তাও রটে গেছে যে, আনন্দবাবু এখান হতেই মেয়ের বিয়ে দেবেন, গ্রামের লোককে এ আনন্দ হতে বঞ্চিত করবেন না। এর মধ্যে চারিদিকে এ কথাও শুনতে পাচ্ছি, এই বিয়েতে থিয়েটার আসবে—বায়স্কোপ আসবে, কত কি হবে—!"

সরিত হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "গ্রামের লোকদের মস্তিষ্ক খুব উর্বর তো! অনেক কিছু তারা এর মধ্যে ভেবে নিয়েছে এবং রাষ্ট্রও করেছে। যাক, বেচারীরা ভেবে এবং বলে সুখী হোক্, তারা তাদের কাজ করুক, আমি আমার কাজ করি।"

বিনয় বলিল, "কিন্তু আমিও যে ঐ দলে।"

সরিত গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভুল করেছো ; যা হবে না, তাই হবে বলে মাথা ঘামাচ্ছো।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "হবে নাই বা কেন ? আনন্দবাবু জমিদার এবং তোমার বাবা তাঁর প্রজা হলেও তোমার মত পাত্র পাবেন কোথায় ?"

সরিত বলিল, "তোমার ধারণায় আমি সুপাত্র কিন্তু মৃণালের ধারণায় হয় তো তা নয়। জানো তো মৃণাল শিক্ষিতা, ধনবান পিতার একমাত্র মেয়ে, তার নিজের মত একটা আছে এবং নিজের ইচ্ছামত সে বিয়ে করতে পারে ; কারণ, শিক্ষার উপরে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে। মৃণালের মত না নিয়ে তার বাপ বিয়ে দিতে পারে না।"

বিনয় বলিল, "আর মৃণালই যদি বলে, 'তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না' ?"

সরিত গম্ভীরভাবেই বলিল, "তার মত হলেও আমার মতামত বলে একটা কথা আছে তো। যে কেউ এসে যদি বলে, 'তোমায় বিয়ে করব' আমি তাতেই রাজি হবো কি ?"

বিনয় মুহূর্ত্তমাত্র নীরব রহিল ; তাহার পর বলিল, "যে কেউ এসে বলবে না সে কথা ঠিক, তবে তোমার মতামত যে আলাদা, সে কথা তুমি বলতে পারো।"

কথাবার্ত্তার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল ভৃত্য।

সরিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি, উমাচরণ! কোন দরকার আছে ?"

উমাচরণ বলিল, "বাবু ডেকেছেন—কি দরকার পড়েছে,—তাই—!"

বিনয় বিদায় লইল।

গম্ভীরমুখে সতীশবাবু বৈঠকখানা ঘরে ফরাসের উপর বসিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইতেছিলেন। সরিতের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি পড়িতে কেবলমাত্র বলিলেন, "বোস !"

সরিত দাঁড়াইয়া রহিল।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সতীশবাবু ক্লান্ত হইয়া যখন মুখ তুলিলেন তখনও সরিত দাঁড়াইয়াছিল।

সতীশবাবু বলিলেন, "বোস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সরিত একপাশে বসিল।

সতীশবাবু অন্যমনস্কভাবে আবার খানিকক্ষণ খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

অসহিষ্ণুভাবে সরিত ডাকিল, "বাবা—"

সতীশবাবু মুখ তুলিলেন।

সরিত বলিল, "আমিও একটা কথা আপনাকে বলব বলে এসেছিলাম।"

সতীশবাবু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বল!"

সরিত একটু ইতঃস্তত করিল, তাহার পর বলিল, "কথাটা হচ্ছে হরেনবাবুদের সম্বন্ধে—"

সতীশবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন; বলিলেন, "তাঁদের সম্বন্ধে কি কথা বলতে চাও—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। যাই হোক্, বল! আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—?"

তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল, বোধ হয় সরিত সব কথা শুনিয়াছে—সেই কথাই সে বলিতে চায়।

সরিত কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "লোকে যে আপনার নিন্দা করে, বাবা! এ আমার সহ্য হয় না! হরেনবাবু আমাদের কারবারের জন্য অনেক খেটেছিলেন, তাঁরই স্ত্রী কন্যা আজ আহারাভাবে মারা যান,—আমাদের কি উচিত নয় তাঁদের মাঝে মাঝে সাহায্য করা? শুনলাম, হরেনবাবুর স্ত্রী মস্ত বড় মেয়েকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন—মেয়েটির বিয়ে দেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই—"

"হুঁ", অনেক কথাই দেখছি তোমার কাণে এসেছে—"

সতীশবাবু সোজা হইয়া বসিলেন, হাতের খাতাখানা সরাইয়া রাখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইলেন। সে দৃষ্টির সামনে সরিত একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

সতীশবাবু বলিলেন, "একটা কথা যে, হরেনবাবু শুধু কাজ করেননি, রীতিমত বেতন নিয়ে কাজ করেছেন,—কথাটা বোধ হয় জান। অমন যে গভর্ণমেণ্ট-সার্ভিস, তাতেও বেঁচে থাকতে পেন্‌সান্‌ পাওয়া যায়, মরণের পরে আত্মীয় স্বজন কেউই একটা পয়সা পাওয়ার দাবী করতে পারে না। তুমি নিশ্চয় এও শুনেছো, হরেনবাবু যেমন কাজ করেছেন, তেমনি বেতনও প্রতিমাসে নিয়েছেন, বিনা বেতনে কাজ করেননি। যেটুকু পরিশ্রম তিনি আমার ব্যবসার জন্য করেছেন, তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও নিয়েছেন।"

মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "হরেনবাবু যে তাঁর স্ত্রী কন্যার জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখে যাননি সেকি আমার অপরাধ? তাঁর স্ত্রী কন্যা আজ খেতে পায় না, তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারিনে। তা যদি হ'তে হয়, তবে আমার ব্যবসায় যে সব কুলি-মজুর কাজ করে, তাদেরও সমান অধিকার পাওয়ার দাবী থাকতে পারে. এ কথা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না।

সরিত মাথা নত করিয়া ছিল, পিতার কথা শেষ হইলেও সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

ত্যক্ত খাতাখানা আবার টানিয়া লইয়া সতীশবাবু বলিলেন, "আশা করি, এ সব ব্যাপার নিয়ে তুমি আর মাথা খারাপ করবে না। এ কথাটাও মনে করো, কারও উপর অনর্থক করুণা করতে যাওয়া অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠে। যাক, নিজের কাজ কর গিয়ে, ওসব কথা থাক্‌।"

সরিত আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল।

* *
*

আজ দুই দিন হইল পিসি-মা আসিয়াছেন। কবে—কোনকালে ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার দেখা-শুনা হইয়াছে তাহা মৃণালেরও মনে পড়ে না। পিসি-মা-সুশীলা গ্রামের বধূ—সেকালের মেয়ে; একালের সঙ্গে তাঁহার মোটে পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। ভ্রাতা দেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া বহুকাল পরে তিনি ভ্রাতার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। এখানে আসিয়াই মৃণালকে দেখিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে নাকি হিন্দুর ঘরে থাকে? তাঁহাদের গ্রামে যে সব মিশনারীরা ধর্ম্ম-প্রচার করিতে যায়, তাহারা অনেকেই বিবাহ করে না; কাজেই তিনি বেশ জানেন—খৃষ্টান মেয়েরাই বিবাহ করে না, হিন্দু মেয়েদের দশ-বার বৎসরে বিবাহ করিতেই হইবে।

চিরকাল লোকের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহারই ভ্রাতার ঘরে এত বড় অবিবাহিতা কন্যা,—ছিঃ ছিঃ, তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া?

সুশীলা একা আসেন নাই, সঙ্গে আছে পুত্র এবং বিধবা একটি কন্যা।

আনন্দবাবুকে লক্ষ্য করিয়া তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "এত বড় মেয়ে রেখে তবু তুমি শান্তিতে দিন কাটাচ্ছো দাদা? আজ বউ থাকলে ওর যে কোন্‌কালে বিয়ে দিয়ে ফেলতো। তুমি যে চোখের সাম্‌নে এই উনিশ-কুড়ি বছরের কুমারী মেয়ে রেখে কি করে নিশ্চিন্ত থাক, তা আমি বুঝিনে। আমাদের দেশে কথাতেই আছে—'সুপাত্র পেলে তখনই মেয়ের বিয়ে দেবে'। তুমি কোন সুপাত্রও কি পাওনি দাদা?"

আনন্দবাবু শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু এতে রাগ করবার তো কিছু নেই সুশীলা! পাত্র পেলে কেউ কি মেয়ে ঘরে রাখে?"

গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে সুশীলা বলিলেন, "তাও কি হয় দাদা—দেশে নাকি পাত্রের অভাব আছে? তারপরে- তোমার তো আমাদের মত নয় দাদা!...আমি না হয় গরীবে ঘরে পড়েছিলাম, যেমন-তেমন করে গরীব কুলীনের ঘরেও মেয়ে দিতে হল; তা ছাড়াও আমার শ্বশুরবাড়ীর বংশের ঐ যে নিয়ম—ওঁরা বংশজের ঘর হতে মেয়ে আনতে পারবেন—মেয়ে দিতে পারবেন না,—কন্যাগত কুল কিনা, তাই কুলীনের ঘরে মেয়ে দিতেই হবে।"

আনন্দবাবু মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তাই দশ বছরে মেয়েকে পঞ্চাশ বছরের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কুলরক্ষা করেছ-না?"

কুন্তলার এ ভাবে বিবাহ দেওয়ার তিনি বিরুদ্ধ মত দিয়াছিলেন

যখন বিবাহের সম্বন্ধ হয়, আনন্দবাবু ভগ্নিপতিকে লিখিয়াছিলেন—"বর্ত্তমানে কুলমর্য্যাদা প্রচলন নাই, পাত্র ভাল পাইলেই কন্যা সম্প্রদান করিবে—মেয়েটির জীবন যেন দুঃসহ করিয়া তুলিও না।"

তাঁহার অমত বুঝিয়া সুশীলার স্বামী বিবাহের সময় তাঁহাকে কিছু জানান নাই; বিবাহ হইয়া গেলে আনন্দবাবু শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; সেই হইতে আজ দশ-বার বৎসর তিনি রাগ করিয়া ভগিনীর কোন সংবাদ লন নাই। তথাপি কুন্তলা যে বিবাহের পরই বিধবা হইয়াছে, সে সংবাদটা তাঁহার শুনিতে বাকি নাই।

সেই প্রসঙ্গে কথা হইতে সুশীলা একটু থতমত খাইয়া গেলেন; বলিলেন, "সে কথা বলতে পার তুমি; কিন্তু বাঁচতো যদি,—জামাই কি বেঁচে থাকতে পারতো না? পঞ্চাশ বছর—এমন কিছু বয়েস নয়—বিশেষ পুরুষমানুষের বয়েস; তখনই তাড়াতাড়ি তার কিছু যাওয়ার সময় হয়নি। তোমার মনে নাই দাদা—আমাদের রাম চাটুয্যে চতুর্থ-পক্ষে বিয়ে করলে যখন তখন তার বয়েস ঠিক একান্ন বছর, হ্যাঁ—আমি তার বয়েস ঠিক জানি,—একান্ন বছর বয়সের একচুল এদিক নয়—ওদিক নয়। সেই দশ এগার বছরের মেয়ে নিজের সিঁদুরের জোরে সেই বুড়োকে পাকা তিরিশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল। মস্ত বড় বড় তিন ছেলে রেখে, দু' ছেলের বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে বুড়ো চাটুয্যে মর্‌লো। তাই তো বলি—এ আমাদের মেয়ের কপাল, অমন স্বামী বাঁচাতে পারলে না! আসল কথা কি জান দাদা, কুন্তলা ঠিক বিধবা হতোই—কপালে যার বৈধব্য রয়েছে, তার ষাট বছরই বা কি আর কুড়ি বছরই বা কি।"

আনন্দবাবু চুপ করিয়া রহিলেন, এমন যুক্তিপূর্ণ কথার উপর তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

কিন্তু সেই কি একদিন—একবার ?...সুশীলা বার বারই তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন—"যেমন পাত্রই হোক, মেয়ের বিবাহ যত শীঘ্র পারা যায়, দেওয়া দরকার।"

মৃণাল বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

সেদিন সে যখন বলিল, "বিয়ে না করলেই বা কি আসে যায় পিসি-মা? শুনেছি সেকালে তোমাদের কুলীনদের ঘরে নাকি বিয়ে হতো না, অনেক মেয়ে কুমারী হয়েও দিন কাটাত। আমিও না হয় কুমারী হয়েই দিন কাটাব, তাতে কি জাত জন্ম যাবে?"

কুন্তলার চেয়ে বয়েসে ছোট এইটুকু মেয়ের পাকা পাকা কথা শুনিয়া সুশীলার আপাদমস্তক জলিয়া গেল, তথাপি শান্তকণ্ঠে গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, "সেকাল আর এ-কাল! সে-কালে আবার এমন অনেক মেয়েও দেখা যেত যাদের বিয়ে হতো শ্মশানযাত্রী বুড়োর সঙ্গে;—বিয়ের সঙ্গেই যাদের বিধবা হতে হতো। আমাদের এক মাসী-মা ছিলেন, তাঁর বিয়েই এমনি করেই হয়; শুনেছি, বিয়ের শেষ মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিধবা হয়েছিলেন।"

মৃণাল শিহরিয়া উঠিল; শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "এমন বিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল?"

"কি দরকার ছিল—!"

পিসি-মা আকাশ হইতে পড়িলেন; বলিলেন, "কি দরকার ছিল তা কি তোমরা আজ-কাল কার দিনে ছেলে-মেয়েরা বুঝবে বাছা! বিয়ে

করতেই হবে—সে তুমি মর আর বাঁচো; বিয়ে না করে সেকালে থাকবার যো ছিল না। দৈবাৎ যে দুই-একটি কুমারী মেয়ে দেখা যেত, নেহাৎ বাধ্য হয়েই তাহাদের কুমারী হয়ে থাকতে হতো; তবু তারা সকলের কাছে ঘৃণার পাত্রী হয়েই এককোণে সরে থাকতো—বাইরের কেউ তাদের কথাই জানতে পারতো না।"

মৃণাল একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও না হয় তাদেরই মতন থাকব পিসি-মা, ঘরেই থাকব—বাইরে বার হব না।"

কিন্তু সুশীলা কিছুতেই খুসি হইতে পারিলেন না; মুখখানা বাঁকাইলেন। সে বাঁকানোর অর্থ মৃণাল বুঝিয়াও বুঝিল না।

* *
*

বাড়ীতে বই লইয়া পড়িতে বসিয়া মৃণালের মন বসিল না। পিসি-মা আজ দুই দিন মাত্র আসিয়া বেশ জাঁকাইয়া লইয়াছিলেন—সব-কিছুই তিনি বুঝিয়া লইয়াছেন। দুইদিনের মধ্যে নিস্তব্ধ বাড়ী সরব হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর লোকজন দাস-দাসী সকলেই বুঝিয়াছে,—তিনি কি ধরণের লোক—প্রকৃতিও তাঁহার কি রকম। কখনও চীৎকার করিতেছেন,—'ঘর-দুয়ার এমন নোংরা করিয়াও রাখিতে হয়—অথচ বাড়ীতে এত দাস-দাসী রহিয়াছে। এমন সব লোক দেখিতে নাই—তাহারা শুধু খাইবে আর আরাম করিবে, মনিবের ভাল-মন্দ দেখিবে না।' কখনও চীৎকার করিতেছেন—'বাসনে দাগ রহিয়াছে কেন? ভাল করিয়া মাজা হয় নাই।'

একটা মানুষ যে এমনভাবে দশটা হইয়া ঘুরিতে পারেন, এ যেন আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হয়। আনন্দবাবুর কোন বালাই নাই, তিনি বেশীর ভাগ সময় তিনতলার ঘরেই কাটাইয়া দেন, সংসারে কোথায় কে কি করিতেছে—কে কি বলিতেছে, সে সব দিকে কাণ দেওয়ার সময় তাঁহার নাই। সম্প্রতি তিনি কতকগুলি বৈষ্ণব-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তন্ময় হইয়া তাঁহার দিন কাটে।

তাহাতেও সুশীলার অভিযোগ-অনুযোগের অন্ত নাই। 'দাদা তো আগে এমন ছিলেন না, সংসারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন—পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচটা আলোচনায় দিন কাটিয়া যাইত।' এরূপ নির্জ্জনে থাকার ফল যে অতি ভয়ানক হয়, তিনি বার বার সেই কথাটার উল্লেখ করেন—মৃণালকেও শুনান।

এত গোলযোগে মৃণাল পড়িতে পায় না—সেদিন তাই বই লইয়া বাগানে বসিয়াছিল।

এ গৃহের চেয়ে অনেক ভাল। নির্জ্জন বাগান, পক্ষীর কলকাকলীতে মুখরিত, ফুলের গন্ধে পূর্ণ। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে মৃণাল নিশ্চিন্ত হইয়া বই খোলে।

"হি-হি-হি—"

হঠাৎ এই উৎকট হাসির শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিয়া মৃণাল মুখ তুলিল।

পিসি-মার গুণবান্ পুত্র নিশানাথ পাতার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে—"হি-হি-হি, ভয় পেয়েছো দিদি! কেমন ভয় দেখিয়েছি বল একবার?"

যে চেহারা তাহার, তাহাতে ভয় পাওয়ারই কথা। গাত্র-বর্ণ ভীষণ কালো, তাহারই মধ্যে সাদা চোখ দুইটি এবং সাদা যে দাঁত কয়টি সর্ব্বদা বাহির হইয়া থাকে, তাহা হঠাৎ দেখিয়া সত্যই ভয় হয়। নিগ্রো প্যাটার্ণের মুখ, নাক চাপা, অধরোষ্ঠ মোটা এবং উল্টানো। ইহার উপরও সে নাকি দুই বৎসর বয়সের সময় আগুণে পুড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে মুখের একপাশটা এমনভাবে বিবর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, যাহা দেখিলে শিশুরা আতঙ্কে চীৎকার করে।

ছেলেটির বয়স সতের-আঠারো বৎসর হইলেও বুদ্ধির পরিপক্কতা আজও লাভ করে নাই, এখনও শিশুপ্রকৃতি রহিয়া গিয়াছে। দুষ্টামিতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। দুইদিনেই সে কেবল বাড়ীতেই নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মা সরস্বতীর সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক ছিল না—একমাত্র বর্ণ শিখিতে তাহার তিন বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল,—বানান কটি শিখিয়া সে শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত আর পৌছায় নাই।

মা তাহাকে ভয় করিতেন, কারণ সে সুবোধ ছেলে ছিল না। দিদিও তাহাকে এড়াইয়া চলিত,—নিশানাথকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না।

মৃণাল দু'দিনেই তাহার অগাধ বুদ্ধির পরিচয় কতকটা পাইয়াছিল। এ দুইদিন তবু সে এমন ঘনিষ্ঠভাবেনিকটে আসে নাই, তথাপি তাহাকে চিনিতে মৃণালের বিলম্ব হয় নাই।

নিশানাথের কথা শুনিয়া মৃণাল হাতের বইখানা মুড়িয়া ফেলিল; বলিল, "তুমি এমন কিছু ভয়ানক মানুষ নও যে তোমাকে দেখে আমার ভয় হবে, কাজেই আমায় ভয় দেখাতে পারোনি এ কথা আমি বলতে পারি।"

সাহস পাইয়া নিশানাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—

"উঃ, কি মোটা বই তুমি পড় দিদি, ও বই পড়েই বা কি হবে বল দেখি? সেদিন তোমার ঘরে ঢুকে চারিদিকে অত বই দেখে আমার তো রীতিমত হাঁপ ধরে গিয়েছিল। কি লাভ হবে অত বই পড়ে?"

কি যে লাভ হইবে, তাহা মৃণাল তাহাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিবে না জানিয়াই সেকথা চাপিয়া গেল ; বলিল, "বই পড়ি কি ছবি দেখি তাই বা তুমি জানবে কি করে ?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া নিশানাথ বলিল, "ছবি দেখ ! কই, দেখি—তোমার বইতে কি কি ছবি আছে—?"

ছ' চারখানা পাতা উল্টাইয়া গোটাকতক ছবি দেখিয়া লইয়া নিশানাথ গম্ভীরভাবে সেখানা ফেরত দিল ; বলিল, "মা বলে—'মেয়েমানুষের বেশী লেখাপড়া শিখতে নেই, সেই জন্যেই তো দিদি বিধবা হয়েছে।' তুমি বেশী লেখাপড়া করো না যেন।"

মৃণাল একটু হাসিয়া বলিল, "আমরা তো মেয়েমানুষ—বই পড়ব না, কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ—তুমি পড়লে না কেন, বল দেখি ?"

নিশানাথ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গেল ; বলিল, "আমি পাঠশালায় আর পড়ব না, পাঠশালার ছেলেরা ভারি নিন্দে করে। ইস্কুলে নাকি আমার মত বড় বড় ছেলেরাও পড়ে, যদি পড়তে হয় আমি ইস্কুলেই পড়ব।"

মৃণাল বলিল, "বেশ তো, ইস্কুলেই পড় না কেন ?"

নিশানাথ বলিল, "ইস্কুল কোথায়, এখানে ইস্কুল তো নেই।"

মৃণাল বলিল, "আছে বই কি ; তুমি যদি পড়, আমি কালই তোমায় ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। বই যা লাগবে, আমি তোমাকে ইস্কুল হতে সে সব দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।"

নিশানাথ বিব্রত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, সে পরে দেখ এখনই তো নয় !"

মৃণাল বলিল, "এখনই নয় কেন, আজ হতেই পড়তে আরম্ভ কর, আমার কাছে বই আছে, আমি তোমায় আজ হতে পড়াবো।"

নিশানাথ মাথা নাড়িল,—"সে আজ তো কোনরকমেই হবে না, আজ যে লক্ষ্মীবার—বিস্যুদবার, আজ মোটে বই ছুঁতে নাই। মা আমাকে অনেকবার বারণ করেছে—'আর যাই করিস্ লক্ষ্মীবারে বইয়ে যেন হাত দিস্ না।'—আর আমাদের গাঁয়ের পাঠশালায় গুরুমহাশয় লক্ষ্মীবারে পাঠশালা করতেন না। তোমরা অনেক বেশী পড় কিনা, তাই কিছুই মানতে চাও না; কিন্তু সত্যি করে এগুলো জেনে রাখা উচিত।

মৃণাল বিস্মিতভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

নিশানাথ চাপাস্বরে বলিল, "তোমার কাছে একটা কথা বলতে এসেছি দিদি,—আমায় কিছু পয়সা দেবে? বড় দরকার পড়েছে কিনা—"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "কি দরকার সেটা ও বলি,—আজ বড় পুকুরে মাছ ধরব, তার জন্যে মসলা কিনতে হবে, মসলা না দিলে মাছ ধরা যাবেনা। আমি কথা দিচ্ছি,—যে মাছই পাই তার মুড়োটা আমি নিজে খাব না; না হয় দাগাই খাব—তোমায় মুড়োটা খাওয়াব,...দাও না কিছু পয়সা!"

মৃণাল বলিল, "আমি মাছের মুড়ো খাইনে, ওটা তুমিই খেয়ো। চার আনা পয়সা আমি তোমায় দিচ্ছি, কিন্তু আর কিছুতে যেন খরচ করো না।"

মা'র ঘর কোণে পয়সা বাঁধা ছিল, মৃণাল সে পয়সা নিশানাথের হাতে

পয়সা লইয়াই নিশানাথ অন্তর্হিত হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"যেন মা কি দিদিকে একথা বলো না, ওদের বললে ওরা কিন্তু তোমায় অনেক কথা বলবে।"

মৃণালও উঠিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করার পথে দেখা হইল, কুন্তলার সহিত।

অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি নিশাকে পয়সা দিয়েছ মৃণাল? না—না, ওটাকে অমন করে পয়সা দিও না, ওতে আরও অধঃপাতে যাবে।"

মৃণাল বলিল, "সে মাছ ধরবে বলে কি সব মসলা কিনিবার জন্যে পয়সা নিয়ে গেছে; আমায় কথা দিয়েছে, মাছের মুড়ো খাওয়াবে।"

কুন্তলা রাগ করিয়া বলিল, "হ্যা, তোমায় মুড়ো খাওয়াবে—না কচু! সেই পয়সা নিয়ে এই বার হয়েছে, আজ সারাদিন আর ফিরছে না,—দেখে নিও।"

রাগ করিয়া সে মাকে খবরটা দিতে গেল।

* *
*

বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়ণী জ্বরে পড়িলেন। জ্বরকে তিনি গ্রাহ্য করেন নাই, সেই জ্বরের উপরেই নিয়মিত কাজকর্ম্ম করিয়া গেলেন—আহারাদিও করিতে লাগিলেন ; উৎসা নিষেধ করিলেও তাহার কথা কাণে তুলিলেন না।

এমনিভাবে তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন—উঠিবার শক্তি মোটেই রহিল না।

সেদিন আকাশের বুকে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ জমিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছে ; সমস্ত রাত ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া প্রাঙ্গণে এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে ;—সাম্‌নে পথিক-পরিত্যক্ত পথটা নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া আছে।

সকাল হইতে কাত্যায়ণী সংজ্ঞাহীনা অবস্থায় পড়িয়া আছেন, উৎসা ডাকিয়া মায়ের সাড়া পায় নাই।

সকাল হইতে অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত চলিয়াছে, উৎসা জ্ঞানহীনা মাকে ফেলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উঠিতে পারে নাই যে কাহাকেও সংবাদ দিবে!

আর সংবাদই বা দিবে কাহাকে,—দরিদ্রা কাত্যায়ণীর কথা শুনিবে কে— উৎসার দুঃখ বেদনা বুঝিবে কে ? একমাত্র সহায় আছে বিনয় ;— কাল নাকি সে বাড়ী আসিয়াছে ; কিন্তু তাহাকেই বা সংবাদ দিতে যাবে কে ?

উৎসা কোনও উপায় খুঁজিয়া পায় না।

বৃষ্টি একবার একটু কমিলে উৎসা এইবার উঠিতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ঝুপ-ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল।

"উৎসা—"

দরজার উপর দাঁড়াইয়া বিনয় ; সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি কম পড়িতে সে কি দরকারে বাহির হইয়াছিল, জোরে বৃষ্টি আসিতে সে উৎসাদের বাড়ীতেই ঢুকিয়া পড়িল।

গ্রামের ছেলে বিনয়, কাত্যায়ণী তাহাকে কোনদিনই পর ভাবিতে পারেন নাই ; নিজের ব্যবহারে সে ইঁহাদের আপনার করিয়া লইয়াছিল।

উৎসা তাহাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখিত—কোনদিন এতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচ করে নাই।

আজ এই অসময়ে উৎসা যাহার কথা ভাবিতেছিল, তাহাকেই আসিয়া পড়িতে দেখিয়া উৎসা হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া ফেলিল।

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বিনয় বলিল, "কিরে, কাঁদছিস কেন ?—কাকীমার জ্বর হয়েছে বুঝি, সে জন্যে একেবারে—"

উৎসা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মাকে ডাকলে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বিনয়-দা—।"

"সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না—?"

উৎকণ্ঠাকুল বিনয় সিক্তবস্ত্রেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

কাত্যায়ণীর ললাটে হাত দিয়া দেখিল জ্বর খুব বেশী ; নাড়ী দেখি অত্যন্ত দুর্ব্বল। অতিরিক্ত জ্বরে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন বুঝি বিনয় মাথায় জল ঢালিবার ব্যবস্থা করিল !

প্রচুর জল ঢালিয়াও রোগিণীর সংজ্ঞা ফিরিল না।

বিনয় বলিল, "বৃষ্টি ধরেছে, আমি এখনি ডাক্তার ডেকে আনছি তুই কাঁদাকাটা করিসনে, মাথায় বাতাস কর, আমার আসতে একটু দেরী হবে না।"

উৎসা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "কোন ভয় নেই তো বিনয়-দা ?"

বিনয় মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, "না—না, ভয় কিছু নেই, এরক অসুখ প্রায় হয় ; বেশী জ্বর এসে মাথায় রক্ত উঠে গেছে, ডাক্তার দেখলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

উৎসা শুষ্ক মুখে বলিল, "কিন্তু বিনয়-দা ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম—"

ধমক দিয়া বিনয় বলিল, "সে সবও তুই ভাবিস নাকি ? তুই এখন ভাব, তোর মা কি ক'রে আরাম হবে ; আর কিছু তোকে দেখতেও হবে না ভাবতেও হবে না।"

সে বাহির হইল।

ডাক্তারের ভিজিটের টাকা পকেটেই ছিল, একবার দেখিয়া লইয়া সে হন্ হস্ করিয়া চলিল।

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে তখন সূর্য্য উঠিয়াছে, টুক্‌রা টুক্‌রা আলো পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, খানিকটা রৌদ্র খানিকটা ছায়া চলিয়াছে—

সোনার সংসার

সরিত বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখিতে তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

বিনয় হন্‌-হন্‌ করিয়া যাইতেছিল, সরিতের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কলকাতা হইতে ফিরেছ বিনয়, আজ এই বেলায় বার হয়েছ। বৃষ্টির জন্যে সকালের বেড়ানোটা আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে দেখছি।"

বিনয় বলিল, "এখন কথা বলবার সময় নাই ভাই, ডাক্তার ডাকতে চলেছি।"

"ডাক্তার ডাকতে—?"

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "অসুখ কার, কি অসুখ?"

বিনয় উত্তর দিল, "উৎসার মায়ের অসুখ; খুব বেশী জ্বর এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ডাকলে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"উৎসার মার—!"

সরিতের মনে জাগিয়া উঠিল, সেই দুঃখিনী বিধবার মূর্ত্তি—অভাগিনী মেয়েটির কথা। করুণায় তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল বলিল, "চল; আমিও তোমার সঙ্গে যাই, ওদের যদি কিছু দরকার লাগে।"

পকেটে হাত দিয়া সে তাহার মণিব্যাগটি বাহির করিল।

বিনয় বলিল, "কিছু দরকার হবে না। যে রকম অবস্থা দেখলাম, আমার নিজের জ্ঞানে মনে হয় বড় বেশীক্ষণ টিকবেন না, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই হয়ত শেষ হয়ে যাবে। একবারমাত্র ডাক্তার এনে দেখানো বই

তো নয়, এই একবারের জন্যে আর তোমাদের নাই বা ত্যক্ত করলাম। তোমার সঙ্গে ওঁদের তেমন আলাপ পরিচয়ও নেই, তোমার টাকা নিতে যে উৎসা রাজি হবে, তা মনে হয় না।"

সরিত এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "না নিক্, তবু গিয়ে দেখতেও কি দোষ হবে বিনয়? গ্রামে একজনের কিছু হলে আর পাঁচজনে তাকে দেখতে যায়, সেটা মনে হয় বিশেষ দোষের হবে না।"

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "যাক্, এরকম দয়ার প্রবৃত্তি থাকাও ভাল। যাবে—এসো, তাতে আর বাধা কিসের।"

চলিতে চলিতে সে বলিল, "তোমরা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় যাবে শুনেছি, গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বা কি লাভ হবে? আর যে সহজে গ্রামে আসবে তা-তো মনে হয় না। সতের আঠার বছর পরে এইমাত্র দুই মাসের জন্যে গরীব দেশের বুকে পদার্পণ করেছ, আবার সতের আঠার বছর পরে ফিরবে তো; কাজেই দেশে লোকের সঙ্গে তোমরা সহজে কিছুতেই মিশতে পার না—পারবেও না। সেই জন্যেই তোমার সাহায্য নিতে পারলাম না; আশা করি, মনে কিছু করবে না সেজন্যে।"

শান্তকণ্ঠে সরিত বলিল, "এ-কথা তুমি বলতে পার, বলাটা অন্যায় নয়। এতকাল গ্রামকে দেখিনি—গ্রাম চিনিনি, শিক্ষার জন্যে বাইরে ছিলাম; তাই বলে কর্ম্মজীবনের দু' পাঁচদিন বিশ্রাম করতে যে আসব না, তাই বা তোমায় কে বললে?"

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল, "সে আমাদের ভাগ্য—গ্রামের সৌভাগ্য!"

* *

*

ডাক্তারও দেখিলেন—চিকিৎসাও হইল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না; সংসারের মায়া কাটাইয়া কাত্যায়ণী ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বিনয় কয়েকদিনের ছুটি লইয়াছিল, সরিত ও সে উভয়ে মিলিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না।

উৎসা সত্যই অভাগিনী হইল—তাহাকে দেখিতে দুনিয়ার কেহ রহিল না।

বিনয়ের এখানে থাকিবার স্থান ছিল ভগিনীর বাড়ী; ভগিনী মাসখানেক হইল পুরী চলিয়া যাওয়ায় বিনয় যখন শনিবারে বাড়ী আসে সে নিজেই রন্ধন করিয়া আহার করে। স্ত্রীলোকবিহীন বাড়ীতে কিশোরী উৎসাকে লইয়া যাইবার সাহস তাহার ছিল না।

বিনয় হতাশ ভাবে বলিল, "উৎসাকে নিয়ে যে ভারি বিপদে পড়লাম, এখন কি করি বলতো?"

সরিত শুষ্কমুখে বলিল, "আমিও অসহায়—বাড়ীতে এ-সব কথা বলবার পর্য্যন্ত আমার উপায় নাই।"

বিনয় বলিল, "সেটা হওয়া স্বাভাবিক।"

সোনার সংসার

উৎসার কাছে বিনয় শুনিতে পাইল, তাহার মামা মহেশচন্দ্র কলিকাতায় কাজ করেন। তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইয়া বিনয় সেইদিনই তাঁহাকে একখানা পত্র দিল।

পত্রের উত্তর আসিল না; আসিবে না তাহা বিনয় জানিত।

সরিত কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; বিনয়েরও তাহার সহিত কলিকাতায় যাইবার কথা ছিল, বিনয় যাইতে পারিল না।

সরিত জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি যাচ্ছ কবে, ওখানে কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

বিনয় বলিল, "কি করে বলব। উৎসার যা-হয় একটা ব্যবস্থা করে তবে আমি মুক্তি পাব। ছোটবেলা হতে বোনের মত কোলে পিঠে করেছি, নিজের বোনের মতই দেখি; এখানে ওকে একা ফেলে রাখতে আমার মনে বাধ্‌ছে। আর দু'একদিন অপেক্ষা করে দেখি, তার পর যা-হয় ওকে নিয়ে গিয়ে ওর মামার কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটি নেব।"

সতীশবাবুরা সব চলিয়া গেলেন।

বিনয় আরও দু'একদিন অপেক্ষা করিল কিন্তু পত্রের কোন উত্তর আসিল না।

উৎসা বলিল, "তুমি আমার জন্যে আর কতদিন এখানে থাকবে বিনয়-দা! ওদিকে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। তুমি যাও, আমি এখানে একা বেশ থাকতে পারব, কিছু ভয় হবে না।"

বিনয় গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইল; বলিল, "ওটি যে হতে পারে না দিদিমণি! তোমার মা যদিও কথা বলতে পারেন নি, তবু শেষবেলায় একবার তাকিয়েছিলেন; তিনি জেনে গেছেন, আমি তোর ভার

নিয়েছি। নিয়েছি যখন, তখন এ বোঝা যথাযোগ্য স্থানে নামাতেই হবে। আমি কাল কলকাতায় যাব, সঙ্গে করে তোকেও নিয়ে যাব; তোর মামার বাড়ী তোকে পৌছে দিয়ে তবে আমার ছুটি হবে।"

বিবর্ণমুখে উৎসা বলিল, "আবার সেখানে কেন?....এখানেই তো বেশ আছি!"

বিনয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখানে তোকে রেখে আমি তো শান্তিতে থাকতে পারিনে দিদিমণি! তোকে যেখানে হোক একটা জায়গায় পৌছে দিয়ে আমি ছুটি নিই।"

উৎসা মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু মামা যদি আমার ভার না নেন···?"

বিনয় চুপ করিয়া রহিল।

কথাটা সে আগে ভাবে নাই, এখন ভাবিয়া দেখিল, সত্যই যদি উৎসার মামা ভার না নেন, তখন—?

তবু উৎসাকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এখানে থাকিবে সে কাহার কাছে,—কে তাহাকে দেখিবে।

চোখের জল মুছিয়া উৎসা প্রস্তুত হইল।

এই পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে উৎসার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। চিরপরিচিত গ্রাম, এই গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কল্পনাও একদিন সে করিতে পারে নাই।

এই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র ঘর, এই পথ-ঘাট, গ্রাম, গ্রামবাসী সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আর হয় তো জীবনে কোনদিনই ফিরিতে পাইবে না।

কিন্তু না—বিনয়কে সে আবদ্ধ করিবে না, যেখানেই হোক একস্থানে গিয়া সে বিনয়কে মুক্তি দিবে।

পরদিন গ্রামের নিকট চিরবিদায় লইয়া উৎসা বিনয়ের সঙ্গে ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

বিদায়—বিদায় গ্রাম, তোমার কাছে চিরবিদায়! উৎসা আর তোমার কোলে হয় তো ফিরিয়া আসিবে না; তাহার পায়ের শব্দ তোমার বুকে আর ধ্বনিত হইবে না; তাহার কণ্ঠস্বর আর তোমার বুকে বাজিবে না! বিদায় গ্রাম—বিদায়!

চোখে জল আসিতেছিল, উৎসা তাহা সামলাইয়া লইল।

শিয়ালদহতে পৌঁছিয়া বিনয় একখানি গাড়ী ডাকিল, কুলীর সাহায্যে জিনিষপত্র নামাইয়া গাড়ীতে তুলিল।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে।

কলুটোলা ষ্ট্রীটে গা ঘেসিয়া একটা অতি সরু গলি কতদূর গিয়া কোথায় শেষ হইয়াছে কে জানে; মাঝে মাঝে এক একটি আলো জ্বলিতেছিল, তাহাতে সে গলির অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারে নাই। যাহাদের বাড়ী গলির মধ্যে তাহারা ছাড়া আর কেহ যে এই গলির পথে যাতায়াত করে তাহা মনে হয় না।

পথ হইতে একটা লোক ধরিয়া জিনিষপত্রগুলি তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া উৎসাকে লইয়া অতি সন্তর্পণে বিনয় অগ্রসর হইল।

চিহ্নিত নম্বরযুক্ত বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র, তাহারই সামনে ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে একখানি তক্তাপোষের উপর বসিয়া স্থূলকায় একটি লোক লণ্ঠনের আলোয় লেখা-পড়া করিতেছিলেন।

বিনয় দরজার উপর দাঁড়াইতে তিনি চোখ তুলিলেন; চশমার ভিতর দিয়া আবছা আলো-অন্ধকারে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, তাই চশমা খুলিয়া ভাল করিয়া চাহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মশাই কি চাই—?"

বিনয় একবার পিছনপানে তাকাইল; তাহার পর এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি জগন্নাথপুর হতে আসছি—।"

"জগন্নাথপুর—?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী যে বিশেষ খুসী হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "জগন্নাথপুর—কোন্ জগন্নাথপুর?"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বিনয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল; বলিল, "কোন্ জগন্নাথপুর তা আপনি বেশই জানেন মনে হয়; সম্প্রতি সেখান হতে পত্রও পেয়েছিলেন কিন্তু একখানা উত্তর দেওয়ার দরকারও মনে করেন নি। মুর্শিদাবাদ জেলার জগন্নাথপুর গ্রামে আপনার এক বোন ছিলেন,...বোধ হয় মনে পড়বে এবার।"

ভদ্রলোক থতমত খাইলেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে সে ভাব সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন, "ওঃ, আপনি সেখান হতে আসছেন? আসুন—আসুন, বসুন। ওরে, ভোলা—ময়শা—কানাই, ওরে, তোরা-সব কোথায় গেলি রে....নাঃ এদের নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি!"

বিনয় হাসি সামলাইয়া বলিল, "থাক—থাক, আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি একা আসিনি, আপনার ভাগ্নীকে-শুদ্ধ নিয়ে এসেছি।"

উৎসাকে সে ঘরের ভিতরে ডাকিল।

বিস্ফারিতনেত্রে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি উৎসার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বিনয় বলিল, "এই আপনার ভাগ্নী—আপনার বোনের মেয়ে যিনি জগন্নাথপুরে থাকতেন। সেখানে এখন একে কে দেখবে, সেই জন্যে আপনার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছি।"

মহেশ দত্ত কতক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধবা—"

বিনয় উত্তর দিল, "না, এখনও বিয়ে হয়নি।"

"বিয়ে হয়নি!...এত বড় মেয়ে—"

মহেশ দত্তের যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"মা লক্ষ্মীর বয়স উনিশ-কুড়ি বছরের কম হবে না মনে হয়।"

বিনয় বলিল, "আজ্ঞে না, পনের-ষোল হবে।"

মহেশ দত্ত বলিলেন, "ও-ই হলো, পনের-ষোল আর উনিশ-কুড়ির মধ্যে এমন কিছু তফাৎ নেই। আচ্ছা এখন থাক, কথাবার্ত্তা যা-হয় পরে হবে এখন—"

বলিতে বলিতে তিনি আবার হাঁক দিলেন, "ওরে, কেলো—ময়শা—ভোলা, সব কোথায় গেলি রে, একবার এদিকে আয়! মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ এসে সঙ্গে করে যে নিয়ে যাবে এমন লোকটি নেই।"

এবার চীৎকারে ফল ফলিল, ভিতর দিক্‌কার দরজার কাছে ছেলে-মেয়ে কয়েকটিকে দেখা গেল; তাহারা প্রমাণ দিল—ভদ্রলোকের ভাগ্যে লক্ষ্মীর কৃপা বিশেষ-রকম না থাকিলেও ষষ্ঠির কৃপা যথেষ্ট আছে।

একটি মেয়ে আগাইয়া আসিতেই মহেশ দত্ত দারুণ মুখ বিকৃত

করিলেন—"এই যে, বাবুদের সব আসা হলো! যাও—এ মেয়েটিকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

মেয়েটি উৎসাকে ডাকিল।

বিনয় বলিল, "যাও ওদের সঙ্গে, আমি আবার দু' একদিন পরে আসব।"

উৎসা নিঃশব্দে ভিতরে চলিয়া গেল।

মহেশ দত্ত বলিলেন, "তুমি আবার কোথায় যাবে, এখানে খাওয়া-দাওয়া—"

বাধা দিয়া সবিনয়ে বিনয় বলিল, "আজ্ঞে, আমি মেসে থাকি, সেখানেই আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক আছে। আমি আবার কাল-পরশু আসব, ওকে দেখে যাব। খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ভাবনা কি, যেদিন বলবেন সেই দিনই এসে খেয়ে যাব।"

মহেশ দত্ত বলিলেন, "কিন্তু উৎসার কথা—"

বিনয় বলিল, "আপনার ভাগ্নী—আপনার বাড়ীতে রইল, ওকেই সব জিজ্ঞাসা করবেন। গাঁ-সম্পর্কে আমার সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র, সে হিসাবে আপনি ওর উপস্থিত সব চেয়ে আপনার লোক।"

মহেশ দত্ত আর কথা বলিতে পারেন না।

বিনয় একটা নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

*   *
*

সরিত বিদায়কালে আনন্দবাবুর সহিত একবার দেখা করিতে গেল।

আনন্দবাবু তখন ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন, নিকটে বসিয়া মৃণাল সেদিনকার সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতেছিল। সুশীলা সেদিনকার আহার্য্যের কথা বলিতে আসিয়া সংবাদপত্রের আকর্ষণে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া নাম লেখা শ্লেটখানা মৃণালের হাতে দিল।

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

মৃণাল বলিল, "সরিতবাবু এসেছেন, সরিত মিত্র।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "এখানে আস্‌তে বলে দাও!"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

একটু রুষ্ট হইয়া সুশীলা বলিলেন, "এই তোমার এক কথা দাদা, যাকে না তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে আসবে। এত বড় বড় কুমারী, বিধবা মেয়ে যাদের বাড়ীতে, তাদের একটু সাবধান হ'য়ে থাকা ভাল নয় কি?"

আনন্দবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি বলছো কি সুশীলা! এতে সাবধান আর অসাবধান হওয়ার মত কি দেখলে? সরিত গ্রামের ছেলে—আমার বন্ধু সতীশের ছেলে, এইটুকু পরিচয়ই কি তার যথেষ্ট নয়?"

অসন্তুষ্টভাবে সুশীলা বলিলেন, "কি করে বলব যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি পেয়েছ? বন্ধুর ছেলে হলেই যে তাঁর সব কিছু জানা হল—তাকে সকলের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যাবে, তা' কি হতে পারে? তোমার তো অমন হাজার বন্ধু আছে দাদা, তাদের সবারই ছেলেকে তুমি বাড়ীর মধ্যে আনবে?"

আনন্দবাবু বলিলেন, "সবারই ছেলেকে না আনতে পারি, সরিতকে আনতে পারি; কিন্তু এসব কথা এখন থাক সুশীলা, সরিত আসছে—"

সরিতের পায়ের শব্দ পাইয়াই সুশীলা পিছনের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সরিত হাসিমুখে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; পিতা-পুত্রী উভয়কে নমস্কার করিতে তাঁহারাও নমস্কার করিলেন।

আনন্দবাবু একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "বস সরিত—"

সরিত একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।

মৃণাল অনুযোগ করিল, "আপনার প্রায়ই আসার কথা ছিল, এই কি সেই প্রায়ই আসা?"

সরিত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "এ-কথা আপনি বলতে পারেন মিস বোস, কিন্তু—"

মৃণাল বাধা দিল; বলিল, "ওই বিলিতি আবহাওয়ার বাইরে আসুন,

দেখি, মিস বোস, মিঃ মিটার এ-সব সম্বোধনগুলো আমাদের ছে দেওয়া উচিত। আজ কালকার দিনে যখন আমরা সর্বাংশে দেশীয় ভা অনুপ্রাণিত হ'তে চাচ্ছি, তখন ও বিলিতি সম্বোধনগুলো যেন কি রব শুনায়? আপনি সোজাসুজি আমার নাম ধরে ডাকবেন,- আমিও আপনাকে মিটার না বলে সোজা সরিতবাবু বলব,- কেমন?"

আনন্দবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই, আর আমি আশাও করি, সরিত কথা রাখবে—।"

লজ্জিত-মুখে সরিত বলিল, "বেশ কথা বলেছেন, আমি আপনা অনুরোধ রাখবার চেষ্টাই করব।"

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর তোমরা কল্‌কাতায় যাচ্ছে কবে—?"

সরিত উত্তর দিল, "আমি আজই বিকালে চলে যাচ্ছি, কাল হ' কাজে জয়েন করতে হবে—বালিতে। বাবা আর বাড়ীর আর-স বোধহয় কালই যাবেন। যে রকম বর্ষা নামলো তাতে আপনাদেরও এ সময় আর এখানে থাকা উচিত মনে হয় না।"

মৃণাল একটু হাসিয়া বলিল, "জ্বরের ভয়ে..."

সরিত বলিল, "তাই বটে, আর তার প্রতাপটাও যে বড় কম নয় তাও আমরা দেখেছি।"

মৃণাল গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেশের কি দুর্ভাগ্য বলুন দেখি?"

সরিত বলিল, "কেন?..."

সরিত বলিল, "একে আপনি সৌভাগ্য বলতে পারেন না যে

যে দেশে এমন সব বড়লোক আছে, যারা ইচ্ছা করলে গ্রামের অসুবিধা দূর করতে পারে, তবু তারা গ্রাম ছেড়ে বাইরে থাকে। কেউ বা সতের বছর পরে, কেউ বা পনের বছর পরে দু'দিনের জন্যে যে আসে, সে পল্লী-মায়ের অশেষ সৌভাগ্য। আমি এই এক মাস গ্রামে থেকে গ্রামের অবস্থা দেখেছি,—যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা কেউ-ই গ্রামে থাকে না—সহরে গিয়ে বাস করে। গ্রামে থাকে নিঃস্ব, দুর্ব্বল, অসহায় লোকেরা,—যাদের কোথাও দাঁড়াবার স্থান নাই—যারা দু'বেলা খেতে পায় না। দুর্ব্বল জীবনভার এরা বহন করে চলে,—জীবন-যুদ্ধে শান্ত ক্লান্ত হয়ে শেষে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ-নিঃশ্বাস ফেলে। এই সব হতভাগ্যরাই পড়ে থাকে গ্রামে; কাজেই আজও ওরা পড়ে থেকে ভুগবে জ্বরে, ভুগবে অনাহারে, বিনা ঔষধে মরবে, পথ্য না পেয়ে মরবে, আর আপনারা আমরা চলে যাব দূরে—যেখানে ম্যালেরিয়া নেই, সেইখানে—প্রাচুর্য্যের মধ্যে—।"

সরিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "এর জন্যে অপরাধী কি আমরাই হব?···আমার মনে হয়, অপরাধী আমরা নই, অপরাধ ওদের;—ওরা কেন এই দারিদ্রের মধ্যে থেকেও সুখ পায়—কেন ওরা অস্বস্তি বোধ করে না, কেন ওরা নিজেদের অদৃষ্ট নিজেরা গঠন করেনি! আমি বিশ্বাস করি মৃণালদেবী, মানুষ নিজেই নিজের অদৃষ্ট গড়ে নিতে পারে, নিজের উন্নতি অবনতির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী, এ জন্যে দায়ী আর কেউ নয়। দারিদ্র্য মহাপাপ, এ মহাপাপ তারা

দে

৬

প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্তে অর্জন করছে নিজেরা নিষ্ক্রিয় থেকে, সকল বোঝা অদৃশ্য ভগবানের প'রে চাপিয়ে দিয়ে, এ-কথা মানবেন কি মৃণালদেবী ?…"

মৃণাল বলিল, "শুধু নিজের অকর্মণ্যতার প'রেও নির্ব্বিবাদে দোষ চাপালে চলে না সরিতবাবু, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুকূল না হয়ে যদি প্রতিকূল হয়, মানুষের ভেতরকার যত শক্তিই থাক না, আমার মনে হয় তা নষ্ট হয়ে যায়। ধরুন,—একজন লোক যদি কোন কাজ করবার ইচ্ছা করে, অথচ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তার প্রতিকূল থাকে, সে যাই কিছু করতে যাক না—তার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে,—তাকে কেউ ফুটতে দেবে না—পায়ের তলায় ফেলে দলে মারবে। নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করতে পারিপার্শ্বিকেরও যে দরকার হয়, সেটা ভুললে চলবে না সরিতবাবু! আপনি বলবেন—আপনি আজ মানুষ হয়েছেন, নিজের পায়ে ভর দিয়েছেন, নিজের কাজ করছেন—সঙ্গে সঙ্গে পরের উপকারও করছেন; কিন্তু আপনি কি আজ এ রকমই হতে পারতেন—যদি না আপনার বাপের অবস্থা আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার অনুকূল হতো, যদি না আপনার মধ্যে শিক্ষিত ও বড় হওয়ার প্রবৃত্তি কেউ না জাগাতে পারতো ? আপনি নিজে বড় হতে পারেন নি সরিতবাবু, আপনার আবেষ্টনি, আপনার পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা আর আবহাওয়া আপনাকে বড় করে তুলেছে, একথা আপনাকে মানতেই হবে।"

সরিত বলিল, "কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে মানতে রাজী নই মৃণাল-দেবী। আপনি কি বলতে চান—সেই সেকালের অন্ধ-অনুকরণ প'রে

আজও আমরা অদৃষ্ট ভেবে বসে থাকব ? আপনি যে কথাগুলি বললেন —নামান্তরে তাকেই অদৃষ্ট ভেবে এই গ্রামের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, তাই তাদের আত্মশক্তি জাগাবার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে তারা সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে বলে বসে,—অদৃষ্ট ; এ ছাড়া তারা আর কিছু বলতে পারে না। তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই তাদের বুদ্ধিও আয়ত্বের মধ্যে। ঐ সীমার বাইরে যে যেতে পারে, সে ধারণা আমি কোনদিন করতে পারব না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা যদি বলেন—অনেক বিষয়-বুদ্ধিহীন লোকের বিষয়ী ছেলে দেখা গেছে, নিরক্ষরের বিদ্বান্ ছেলে দেখেছি,—সংসারীও সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আসল কথা, মানুষ নিজকে যদি ফুটিয়ে তুলতে চায়, যদি সত্যকার কাজ করতে চায়, পারিপার্শ্বিক প্রতিকুলতাকে সে নিজের মতেই খাপ খাইয়ে নেবে, বিরুদ্ধমতবাদীকেও স্বমতে টানবে। দৃষ্টান্ত যদি চান, আমি ঢের দিতে পারি।

আনন্দবাবু বলিলেন, "বিশেষ করে ধর্ম্মোদ্দেশে এ-রকম ঘটনা ঘটতে আমরা ঢের দেখতে পাই।"

সরিত বলিল, "কেবল ধর্ম্ম কেন—যে কোন ক্ষেত্রেই দেখুন, এর প্রমাণ ঢের পাবেন। আসলে চাই মনের শক্তি—যাতে অসম্ভবও সম্ভব হয় যায়, আর সেটা ঘটাও কিছু বিচিত্র নয়। আজ রেডিয়ো বলুন, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন—ইত্যাদি, এর কোন কল্পনাই কি মানুষ করেছিল ? সক্রেটিসকে কেউ কোনদিন আগে মেনে নিয়েছিল—পরে মানতে বাধ্য হয়েছিল—এর প্রমাণ আমরা পাই ; পাই কি না, বলুন কমলদেবী ?"

মৃণাল বলিল, "কিন্তু সে-সবের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান গ্রামের অধিবাসীদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?"

সরিত বলিল, "আছে বই কি—যথেষ্ট আছে। আপনি বললেন—এরা কি করে বড় হবে—জ্ঞান পাবে, কেন না পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এদের অনুকূল নয়। আমি বলছি—এরা যদি চেষ্টা করে, বড় হওয়ার দিকে—মানুষ হওয়ার দিকে—এদের যদি একাগ্র লক্ষ্য থাকে, আবহাওয়া থাক না কেন প্রতিকূল, তা'কেই এরা অনুকূল করে নেবে। অর্থাৎ কিনা সোজা কথায় আমি বলতে চাই—কেন এরা এমন জড়ভাবে থাকবে, কেন এরা তিলে-তিলে মৃত্যুকে বরণ করবে? এরা নিজেদের জাগিয়ে তুলুক, নিজেদের ভার নিজেরা নিক, সকল বাধা সরে যাবে—নিজেদের গ্রামকে এরা আদর্শ-গ্রাম গড়তে পারবে। বাপ পিতামহ যে ভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন, সেভাবে এখন দিন কাটানো চলে না, কারণ সেদিন তাঁদের অবস্থার অনুকূল থাকলেও বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থার অনুকূল নয়।"

তর্কে পরাস্ত হইয়া মৃণাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "অর্থাৎ আপনি কি বলতে চান এখন, এই সব গ্রামের লোকের—

বাধা দিয়া সরিত বলিল, "হ্যাঁ, এরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে ভগবানের উপর সকল ভার না চাপিয়ে, নিজেরাই প্রতিবিধানের উপায় করবে। ধনীরা যদিই তফাতে যায়—তাতেই বা তাদের কি—? ধনী স্বভাবতঃই আত্মসুখপরায়ণ হবে—চিরকাল এমনিই তো হয়ে আসছে আজ তার মধ্যে এমন কিছু বাড়াবাড়ি তো আমরা দেখিনে—যার জন্যে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ল বলে সবাই চীৎকার করব?"

মৃণাল বলিল, "বরাবর ধনী দরিদ্রকে অবহেলা করে আসছে—তারা আত্মসুখ-পরায়ণ হয় ?"

সরিত বলিল, "নিশ্চয়ই হয়। আপনি খুলুন সেকালের ইতিহাস, পুরাণগুলো, তাতে কি দেখতে পাবেন না ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার—জাঁকজমক ? রাজা স্বর্গে চলেছেন, পাল্কী বইবার ভার পড়লো গরীব মুনিদের' পরে ; যযাতি যজ্ঞ করলেন—সোনা দিয়ে কিনতে পাঠালেন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে ; দরিদ্রকে বাদ দিয়েই ধনীরা চলে—অথচ তাদেরই দরকার হয় প্রতি পদে। দরিদ্র উপায়হীনকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে চিরকালই দাঁড়াতে হয়, আজও হবে, তাতে তো বৈচিত্র্য কিছু নেই।"

মৃণাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

*   *

*

আনন্দবাবু সোজা হইয়া বসিলেন ;—বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছ সরিত, এতে তোমার কথা বলবার আর কিছু নেই মিনু—অন্ততঃপক্ষে আমার বিশ্বাস তাই। আবহমানকাল ধরে এই একই ধারা চলে আস্‌ছে, আজও দরিদ্রকে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে। দাতার দানে পুষ্টি নয়, স্বোপার্জ্জিত জিনিসে পুষ্টি লাভ করতে হবে, জোর করে দখল করতে হবে—ভিক্ষা চেয়ে নয়।"

মৃণাল অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "স্বোপার্জ্জনের পথ তো দেখাতে হবে বাবা ;—নিজের শক্তি সম্বন্ধে যারা উদাসীন, তাদের জানিয়েও তো দেওয়া চাই—তাদের শক্তি আছে।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "সে পথ দেখিয়ে দেওয়া যাচ্ছে তো,—কিন্তু তাই বা ওরা নিচ্ছে কই ? তাই তো সরিত বলেছে, ওরা নিজেরা কষ্ট পায়—কেউ ওদের কষ্ট দেয় না।"

সরিত বলিল, "যাক্, এ-সব কথা যেতে দিন, আর অনর্থক এ-সব আলোচনায় কোন লাভ নেই। দেশের কথা ভাবতে গেলে, মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

মৃণাল বলিল, "সেই জন্যেই দেশ ছেড়ে পালান—দেশে আসতে চান
া, কেমন ?..."

সরিত আশ্চর্য্যভাবে চাহিয়া আছে দেখিয়া আনন্দবাবু বলিলেন,
ওর কথা ধরো না সরিত, যেতে দাও। হ্যাঁ কি বলছিলে,—তুমি আজ
লে যাচ্ছো—বালিতে কাজ করবে ?...আমরাও যাব মনে করেছি।
ামি অনেক আগেই যেতে চেয়েছিলুম—কেবল মিনুর জিদে আমার
ওয়া হয়নি।"

মৃণাল বলিল, "কেন বাবা, তুমিই তো একদিন বলেছিলে, গ্রাম
তামার খুব ভাল লাগে।"

আনন্দবাবু একটা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "লাগে নয়—
াগতো ; যখন ভাল লাগতো তখন থাকতুম, যেদিন ভাললাগা ফুরিয়ে
ল, সেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেছলুম—আর আসিনি ; এখনও
াসতুম না মা, কেবল তোরই জিদে আমায় আসতে হয়েছে।"

মৃণাল বলিল, "তা হলে আবার আসতে হবে বাবা, কারণ আমার
ড় ভাল লেগেছে, লেগেছে বলেই আমি গ্রামের জন্যে কিছু কাজ
রব ঠিক করেছি।"

আকাশ ঘিরিয়া কালো মেঘ সাজিয়াছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া
রিত উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, মৃণালের কথা শুনিয়া সে যাইবার
থা ভুলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামের জন্যে কি কাজ করবেন শুনি—?"

মৃণাল তাহার কণ্ঠে যেন এতটুকু বিদ্রূপ লক্ষ্য করিল ; সে
লিল, "গ্রামের যারা আজও পথ চিনতে পারেনি, তাদের পথ

চেনাব। গ্রামের মেয়েরা যাতে শিক্ষা পায়, তাঁর ব্যবস্থা করব—তাদের মানুষ করে তুলব। ওদের কাছ হতে ওদের ছেলে মেয়ের শিক্ষা পাবে, তারাও মানুষ হবে।"

সরিত বলিল, "আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু এতে আপনাকে বা কম উৎপীড়ন সইতে হবে মনে করবেন না। প্রথমেই লোকে জানতে চাইবে আপনি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন কি না, ফলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আপনার প্রাণান্ত হবে, যার ফলে আসবে বিরক্তি এবং তার জন্যই আপনি সে কাজ ছেড়ে দেবেন।"

মৃণাল বলিল, "কার্য্যকালে বোঝা যাবে এগিয়ে যেতে পারি কি না। নিজের ভাল সকলেই বোঝে; সেই হিসাবে এরা যতদূর অজ্ঞ হোক—আমার মনে হয়, ভালটা বুঝবে।"

সরিত বলিল, "আমি যতদূর দেখেছি, তাতে মনে হয় না এরা সহজে কোন কিছু নেবে। তবে কথা হচ্ছে—দৃঢ়বদ্ধ খুঁটি যদি বার বার নাড়া যায়, সে শিথিল হতে হতে একদিন উপরে পড়ে যায়। মানুষের সংস্কারের মূলে আঘাত পড়তে পড়তে যখন মূল শিথিল হয়ে যাবে, তখন হয় তো এরা নিজেদের সত্ত্বা বুঝতে পারবে। কিন্তু সেদিন আসতে দেরী আছে মৃণালদেবী।"

মৃণাল উত্তর দিল, "আমার মনে হয়, বেশী দেরী নেই। সহ্যের শেষ সীমায় এসে মানুষ দাঁড়িয়েছে, চারিদিক তাদের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে বলেই আজ তারা চাইছে আলো—চাইছে পথ—চাইছে মুক্তি। যুগ যুগ তারা যার অনুকরণ করে চলেছে, আজকে তা আর চলবে না তা তারা বুঝেছে, তাই তারা চলতে চায়—পথ

পেতে চায়! আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি—এরা সহের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, আর এরা এ অবস্থায় থাকতে রাজি নয়। আমার জীবনে প্রথমতঃ প্রধান লক্ষ্য এদের টেনে তোলা, এদের সাহায্য করা। হয়তো এতে আপনাকেও দরকার হবে সরিতবাবু, আশা করছি সেদিন আপনার সাহায্য পাব।"

সরিত প্রফুল্লমুখে বলিল, "নিশ্চয়ই, আমি আনন্দের সহিত রাজি আছি মৃণালদেবী, আপনার যখনই দরকার পড়বে আপনি অসঙ্কুচিত-ভাবে আমায় ডাক্‌বেন। আচ্ছা, আজ আমি উঠি, কলকাতায় গেলে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, কল্‌কাতায় গিয়ে তোমায় খবর দেব, একটা দিন ছুটি করে এসো—।"

সরিত নমস্কার করিয়া বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে মৃণালও বাহির হইল।

ঝির্ ঝির্ করিয়া পাতলা বৃষ্টিধারা ঝড়িয়া পড়িতেছিল,—

মৃণাল বলিল, "একটা ছাতা নিয়ে যান সরিতবাবু, বৃষ্টিতে ভিজবেন না।"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল, "এইটুকু বৃষ্টিতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না মৃণালদেবী! আচ্ছা চললুম..."

নমস্কার করিয়া সে পথে নামিয়া পড়িল। সোজা পথে খানিকদূর গিয়া একটা বাঁকের আড়ালে কোথায় মিলাইয়া গেছে, ঝোপের আড়ালে আর দৃষ্টি চলে না। যতক্ষণ সরিতকে দেখা যায় মৃণাল চাহিয়া রহিল।

কয়েকদিন মাত্র বর্ষা নামিয়াছে—ইহারই মধ্যে পথের দু'ধারে শুষ্ক তৃণপুঞ্জ আবার শ্যামল-রূপ ধরিয়াছে, গাছে নূতন পাতা ধরিয়াছে। সামনেই কদম্ব ফুলের গাছটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দূরে দেখা যায় দরিদ্রের পর্ণকুটীরগুলি,—কুটীরের সম্মুখদিক্ পরিষ্কার—ঝক্‌ঝকে, চারিধার রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। উহারই মধ্যে, উঠানের পাশে কাহারও আছে—লাউ কুমড়া পুঁইশাকের মাচা, কাহারও উঠানের ধারে ঝিঙে প্রভৃতি লতানো গাছ।

মৃণাল তাকাইয়া রহিল।

পথে দুই একটি লোক দেখা যায় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছে, কাহারও মাথায় মাথালী, কাহারও ছাতা।

কাল যে স্ত্রীলোকটি স্বামীর ও পুত্রের অসুখের জন্য মৃণালের নিকট হইতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ লইয়া গিয়াছিল, সে এই সময় আসিয়া দাঁড়াইল।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম, তোমার স্বামী, ছেলে সব কেমন আছে, রহিমা ?"

রহিমা শুষ্কমুখে জানাইল—অবস্থা বিশেষ সুবিধা নয়; স্বামী সকাল-সকাল দু'টি খাইতে বসিয়াছিল,—সেই সময় এমন জ্বর আসিয়াছে যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

মৃণাল রুষ্ট হইয়া বলিল, "ভাত দিতে বারণ করেছিলুম না, তবু আবার ভাত দিয়েছ ?"

রহিমা সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "কি করব দিদিমণি, কিছুতেই শুনলে না;—'তিন দিন উপোস করে আছি, আজ ভাত খাবই।' এই বলে সেই যে কালকের চাট্টি পান্তা পড়েছিল—"

"এই জ্বরের ওপর আবার পান্তা..."

মৃণাল রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না; বলিল, "যাও, তোমায় আমি আর ঔষধ দিতে পারব না; তুমি যেখান হ'তে পার ঔষধ এনে খাওয়াও গিয়ে। যারা কথা শোনে না, সমান অত্যাচার করে, তাদের ঔষধ দিয়ে নষ্ট করতে আমি চাইনে।"

রহিমা শুষ্ককণ্ঠে বলিতে গেল—"দিদিমণি—"

জ্বলিয়া উঠিয়া মৃণাল বলিল, "না, আর কথা শুন্‌তে চাইনে। যাও বল্‌ছি—এখননি বার হয়ে যাও—"

নির্ব্বাকে চোখ মুছিতে মুছিতে মেয়েটি চলিয়া গেল।

মৃণাল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সরিতের কথা তাহার মনে হইল। সত্যই ইহারা বড় অসহায়, ইহাদের অজ্ঞতায় রাগ দুঃখ কিছুই করা চলে না,—ইহারা করুণাপ্রার্থী, এই করুণার দান গ্রহণ হইতে ইহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে।

মৃণাল রহিমার খোঁজ করিল, কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে।

* *

*

উৎসার মামা মহেশ দত্ত।

দু'দিন থাকিতে থাকিতেই উৎসা মামার পরিচয় পাইল।

অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির লোক—ব্যয়কুণ্ঠতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। যদি এক পয়সায় চলে, দুই পয়সা তিনি কিছুতেই খরচ করেন না।

উৎসা দু'দিনেই হাঁফাইয়া উঠিল।

দেশে থাকিতে যে অবাধ-স্বাধীনতা তাহার ছিল, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। বনের পাখীকে খাঁচায় ভরিয়া রাখিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, উৎসার অবস্থা ঠিক তেমনই হইয়াছিল।

এতটুকু করিয়া তিনখানি ঘর, ছাদ যেন বুকে আসিয়া ঠেকে, জানালা দরজা একেবারে প্রাচীনকালের প্রস্তুত, নিঃশ্বাস ফেলিবার যো পাওয়া যায় না। যাহারা এ-রকম স্থানে এ-রকম ঘরে জন্মাবধি প্রতিপালিত হয়, তাহাদের ইহাতে কোন কষ্ট হয় না। ইহাদের সহিত খাঁচার পাখীর তুলনা করা চলে এবং সেই জন্যই ফাঁকা জায়গায় গিয়া ইহারা টিকিতে পারে না।

অপরিসর উঠানটুকুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আকাশের এতটুকু মাত্র দেখা যায়,—সে দেখা না দেখারই মত। আশে-পাশের বড় বড় বাড়ীগুলো বুক পিঠের উপর যেন চাপিয়া বসিয়া আছে।

উৎসা স্বপ্ন দেখে তাহার গ্রামের—কি অনন্ত উদার আকাশ, সে আকাশের যেন কূল-কিনারা নাই। সে আকাশে যে চন্দ্র উঠে, যে তারাগুলি ফুটে, তাহারা উৎসার বড় পরিচিত—প্রত্যেকটীকে সে চেনে। এখানকার ওই অপরিসর মুক্তস্থানটিতে দাঁড়াইয়া সে তাহারই একটী তারাকে দেখিতে পায়,—সেও যেন উৎসার পানে তাকাইয়া থাকে।

সেখানে ছিল কত নাম জানা—নাম না জানা পাখীর দল, তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া নীল আকাশের কোল বাহিয়া গান গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া যাইত, আবার সূর্য্যাস্তের প্রারম্ভে তাহারা ফিরিয়া আসিত। নাম জানা বা নাই জানা থাক, প্রত্যেক পাখীটা ছিল তাহার বড় পরিচিত।

চির সবুজের রাজত্ব সেখানে—লতায় পাতায় জড়াজড়ি,—সবুজের বুকে সবুজ হাওয়া প্রাণ তাজা করিয়া দিত; যত অবসাদই আসুক, নিঃশেষে সব মুছাইয়া দিত। আর এখানে—শুধু বাড়ীর পর বাড়ী।

ইট পাথরের তৈরী বাড়ী, সরসতা নাই—জীবন নাই, আছে রসশূন্য নির্জ্জীবতা; পাখীর গান নাই, নদীর কুল্‌কুল্‌ মধুর স্বর নাই, বাতাসের মৃদু সোঁ-সোঁ শব্দ নাই, আছে শুধু কলকারখানার শব্দ, লোহা-লক্কড়ের ঝন্‌-ঝনানি।

উৎসা সময় সময় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, কিন্তু উপায় নাই—কোন উপায় নাই।

ইহার উপর মহেশদত্তের কঠোর স্বভাব তাহাকে আরও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম দিন মামা তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া লইয়াছেন উৎসা যখন প্রথম পদার্পণ করিল, তাহার পরিচয় যখন তিনি পাইলেন তখনও তাঁহার মনের কোণে হয় তো আশা ছিল—সে অন্ততঃপক্ষে কিছু হাতে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখে যখন শুনিতে পাইলেন সে কিছু আনে নাই, তখন হইতেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

নিজের সংসারে চারটি মেয়ে, দুইটি ছেলে; বড় মেয়েটী তিনটি সন্তান লইয়া বিধবা অবস্থায় পিতার স্কন্ধে ভর করিয়াছে। মেজ মেয়েটিও দু'টি সন্তান লইয়া সম্প্রতি আসিয়াছে; ইহার উপর উৎসা আসিয়া ভর দেওয়ায় মহেশদত্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার সহ্যশক্তি সীমা ছাড়াইয়া গেল। তিনি স্বভাবতঃই খিটখিটে স্বভাবের লোক ছিলেন, মেজাজ আরও চড়িয়া গেল,—যাহাতে বাড়ীর সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল।

এখনও দুইটী মেয়ে অবিবাহিতা; একটির বয়স আঠারো-উনিশ বৎসর হইবে, অপরটি চৌদ্দ-পনের বৎসরের হইবে। এই দুইটি বিবাহ যোগ্যা মেয়ের পানে তাকাইয়া পিতামাতার অশান্তির শেষ ছিল না।

অনেক ভাবিয়া মহেশদত্ত ঠিক করিলেন, সকলকে গ্রামের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন; সেখানে অল্প খরচে দিন চলিবে।

বিনয় যে সেই গিয়াছে, এই আট-দশ দিনের মধ্যে সে আসে নাই। উৎসা একবার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। বিনয়ের এখান হইতে বদলী হইবার কথা ছিল, হয় তো সে চলিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে কাহারও সহিত দেখা করিয়া বলিয়া যাইতে পারে নাই; উৎসা তাহাই ঠিক বলিয়া জানিয়াছিল।

মামার চেয়ে মামীর বাক্যবাণের বিষ আরও বেশী। মামা বেশী কথা বলেন না, কেবল গোঁ-গোঁ করেন মাত্র, কিন্তু মামী চোখা চোখা তীর মারেন।

ইহার মধ্যে উৎসার সমবেদনার পাত্রী সতী,—মামার বিধবা মেয়েটি।

প্রায় পিতার বয়সী বৃদ্ধ স্বামী তাহার ;—পূর্ব্ব-পক্ষের দুইটি উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান, বৃদ্ধ তাহাদের লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত পুত্রেরা পিতার এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে নাই এবং নব-বধূকেও মানিয়া লইতে পারে নাই।

তিনটি সন্তান লইয়া বিধবা অবস্থায় সতী তাহাদের আশ্রয়-প্রার্থিনী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্থান দেয় নাই ; বাধ্য হইয়া সতীকে পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছে ;—দুনিয়ায় আর তাহার কোন আশ্রয় নাই।

মা নিজের মেয়েটিকে ভালবাসেন ;—নেহাৎ নাড়ীর টান—তাই, নাতি-নাতিনীগুলিকে দেখিতে পারেন না। পিতা বিধবা কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া মুখ বিকৃত করেন।

সতী নিজে বেদনা পায় বলিয়াই উৎসার বেদনা বুঝিয়াছে।

উৎসা তাহার কাছে দুইটি কথা বলিয়া বাঁচে,—সতী তাহাকে সান্ত্বনা দেয়—বুঝায়।

মামী কোন কাজে এতটুকু ত্রুটি দেখিলে বিরক্ত হন ; স্পষ্টই বলেন, "ওসব আদর আব্দার চলবে না বাছা,—এখানে খেটে তবে খেতে হবে। আর এখানেই বা বলি কেন—যেখানেই যাও, ভূতের

মত খাটতে হবে তবে হু'টো ভাত পাবে। বসিয়ে ভাত-কাপড় কেউ যোগাতে পারবে না।"

কখনও বলেন, "মা কি একখানা কাজ করতেও শিখায় নি? এদিকে তো শুনি, লোকের কাছে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে দিন চালাতে হতো,—গরীবের মেয়ে যেন বড়লোকের মেয়ের মত, একটু নড়ে বসতেও পারো না?"

উৎসার চোখে জল আসে।

দরিদ্রা মা কখনও একটা কড়া কথা বলেন নাই, যাহাতে উৎসার মনে এতটুকু ব্যথা লাগে। আজ সেই উৎসাকেই পদে পদে অপমান সহিতে হইতেছে, লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে।

একবার যদি বিনয় আসিত।...

আরও একজনের কথা মনে হয়, সে সরিত।

সেই হুর্দ্দিনে ধনীপুত্র সরিতও আসিয়াছিল। বিনয়ের সহিত মিশিয়া সে যতখানি পারে সাহায্য করিয়াছিল।

সেই সময়ে সরিত বলিয়াছিল সে কলিকাতায় থাকিবে,—ঠিকানাও সে দিয়াছিল,—যদি কোনদিন দরকার পড়ে উৎসা যেন একটা খবর তাহাকে দেয়। সে ঠিকানাও কোথায় হারাইয়া গেছে কে জানে, উৎসা নিজের ছোট বাক্সটা আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, সবই আছে, নাই শুধু সেই কাগজখানা।

উৎসা কোন কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না—কাহাকেও কোন সংবাদও দিতে পারিল না।

*

পূজার দশদিন বন্ধ মাত্র; মাতুল প্রস্তাব করিলেন, ছুটিতে বাড়ী যাইবেন ;—উপস্থিত সকলেই সেখানে থাকিবে। আয় বুঝিয়া আবার সকলকে তিনি কলকাতায় আনিবেন।

যে ছেলেটি কাজ করে, সেইটি কেবলমাত্র তাঁহার 'নিকটে থাকিবে ; ছোটটি বাড়ীতে থাকিবে—সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, বাজার-হাট করিবে।

বাড়ী বশিরহাটের নিকটে পল্লীগ্রামে ; কলিকাতার বাস উপস্থিতের মত তুলিয়া দিয়া মহেশ দত্ত সপরিবাবে গ্রামে আসিয়া উঠিলেন।

আর যাহার যত অসুবিধাই হোক্, উৎসা গ্রামে আসিয়া বাঁচিয়া গেল। গ্রামের মাটিতে পা দিয়া তাহার পা জুড়াইয়া গেল, সবুজ গাছের পাতার বাতাস তাহার মনপ্রাণ জুড়াইয়া দিল।

কি সুন্দর উদার বাতাস,—কতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া স্পর্শ করিয়া যায় ; উন্মুক্ত বিশাল আকাশ—তাহার বুকে রাত্রে ফুটিয়া উঠে কত নক্ষত্র,—চাঁদ সীমাশূন্য কিরণ ছড়ায়। সবুজ ঘাসে ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথ—খানিকদূর সোজা গিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়।

সোনার সংসার

স্রোতশূন্য নদীর জল পদ্মবনে ছাইয়া গেছে, নদীর বুক আলো করিয়া অগণ্য পদ্মফুল ফুটিয়াছে। নদীর ও-পারে গ্রাম্য-দেবী শীতলার জীর্ণপ্রায় মন্দিরটী ঘন গাছের পাতার ফাঁকে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময় সেখানে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,—এ-পারে সে শব্দ ভাসিয়া আসে।

উৎসা যেন নবজীবন ফিরিয়া পাইল।

গ্রামের মেয়ে গ্রামকেই ভালবাসে, সহরের জীবন তাহার কাছে বন্দী-জীবন।

গ্রামের পূজার উৎসব অন্তর স্পর্শ করে। সহরের পূজায় যেন প্রাণ নাই; উৎসব আরম্ভ হয় দোকানে, বাজারে—গৃহস্থের বাড়ীতে নয়।

গ্রামের পূজা দেখিবার মত। প্রবাসীরা বাড়ী ফিরিয়া আসে, গৃহে গৃহে আনন্দ-স্রোত বহিয়া যায়, শিশুদের মুখে হাসি ধরে না। পূজার ঢাকের শব্দ কানে আসিতে সকলে ছুটে। কতদিন পূর্ব্ব হইতে চলে পূজার সমারহ—যখন প্রথম প্রতিমা গঠন আরম্ভ হয়। বিচালী বাঁধা হইতে মাটির প্রলেপ, তাহার পর পালিস, রং দেওয়া, অবশেষে সত্যকার পূজা সুরু হয়।

প্রতিমা গঠনের কৌশল এ-দেশের শিশুরা সব জানে।

ঢাকের বাদ্য ষষ্ঠির দিনে দিক্ দিগন্তরে ছুটিয়া যায়, কত দূরদূরান্তর হইতে স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুর দেখিতে আসে।

এ তিন দিন রক্ষিত বাড়ী আগত লোকজনদের এক সরা মুরকি ও নারিকেল নাড়ু দেওয়া হয়,—তাহারা মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়।

সোনার সংসার

উৎসার বড় ভাল লাগে।

মনে পড়ে ছোটবেলায় সেও একদিন লাল ডুরেশাড়ী জড়াইয়া ঠাকুর দেখিতে ছুটিত,—সঙ্গিনীদের সঙ্গে এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইত।

সে কি আনন্দ,—আজও সে আনন্দের স্মৃতি মনে জাগে।

পল্লীগ্রামে আসিতেই শরতের শিউলির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া উৎসাকে বর্ত্তমান ভুলাইয়া দিয়াছিল। মনে করাইয়া দিয়াছিল—তাহাদের গ্রামে এমনই ফুল ফুটিত, সকালে ঝরিয়া পড়িয়া তলা বিছাইত। সেই ফুল কুড়াইয়া শৈশবে সে মালা গাঁথিত, শুকাইয়া ফুলের বোঁটার রংয়ে কাপড় রাঙ্গাইয়া পরিত।

আজ কোথায় সেদিন।....

গ্রামের বাউল সকালে একতারা বাজাইয়া দরজায় গান গায়—

'গা তোল—গা তোল রাণী,
তোর হারা উমা এলো ঐ—'

এই গান আর গানের সুর প্রাণে অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগাইয়া দেয়; রোগী রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, শোকার্ত্ত শোক ভুলিয়া যায়।

পূজা আসিল, ষষ্ঠীতে বোধন বসিল,—মহেশ দত্ত এ-কয়দিন এখানেই রহিলেন। সপ্তমীর দিনে মেয়েরা রক্ষিত মহাশয়ের বাড়ী আরতি দেখিয়া আসিল।

সতীর কোলের মেয়েটির জ্বর, সে আরতি দেখিতে যায় নাই, মেয়েটিকে লইয়া ঘরেই ছিল। মা ফিরিয়া পা ধুইয়া আসিয়া বারাণ্ডায় বসিলেন; গৃহমধ্যস্থা কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মাগো, কি পেটের শত্রুই হয়েছে; একদণ্ড যদি নড়তে দেয়! আর তোকেও

বলি সতী, অমন ক'রে মায়ায় জড়াস্‌নে। যাদের জিনিষ তারা দেখবে না, যত দায় কি তোর ?"

গৃহের মধ্যে থাকিয়া সতী চুপ করিয়া শুনিয়া গেল, মায়ের কথার একটি উত্তরও দিল না।

কাহার জিনিষ—কে দেখবে—?

মহেশ দত্ত তাহাকে সপত্নী-পুত্রের নিকট হইতে খোরপোষ আদায়ের মামলা আনিতে বলেন, সতী তাহা পারে নাই। সে সম্প্রতি অনুনয়-বিনয় করিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিল,—যদি তাহারা দয়া করিয়া দশটা করিয়া টাকাও মাসে মাসে দেয়, সতী তাহাই দিয়া কোনক্রমে দিন চালাইতে পারে।...

কিন্তু সপত্নী-পুত্রেরা কোন উত্তর দেয় নাই;—তাহারা যে উত্তর দিবে না, সে জানা কথা; তাহার দুর্ভাগা সন্তানদের যে কেহ দেখিবে না, তাহা সতী জানিত। জগতের সকলেই তাহাদের ত্যাগ করিবে, ত্যাগ করিতে পারিবে না কেবল সতী;—কারণ, সে যে তাহাদের মা।

মা যে সতীর দুঃখ বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনিও স্বামীর বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারেন না, স্বামীর উপর রাগ করিয়াই তিনি মেয়ের উপর খড়্গহস্তা হইয়া উঠেন।

সতীর জন্য তিনিও রাত্রে আহার করা ছাড়িয়া দিয়াছেন, একবেলা তিনিও আহার করেন। সতী নির্জলা একাদশী করে, মা সেদিন কোনমতে ভাতের কাছে বসেন মাত্র; একগ্রাস ভাত মাত্র মুখে দিয়া উঠিয়া পড়েন, সতী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাঁহাকে খাওয়াইতে

পারে না। আহারের মত বসন-ভূষণেরও ব্যবস্থা চলিয়াছে, নেহাৎ যাহা না করিলে নয়, তিনি তাহাই করেন।

বিধবা মেয়েকে সাম্‌নে রাখিয়া মায়ের দিন এমনই কাটে।

বড় অসহ্য হওয়াতেই তিনি সময় সময় তিরস্কার করেন,—"হতভাগি মেয়ে, আর পাঁচটা বছর স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখতে পার্‌লি না! মেয়েটার বিয়ে দিয়ে, ছেলে দু'টোকে আর একটু বড় ক'রে না-হয় যেতো!.. এখন তুই দাঁড়াবি কোথায়—খাবি কি—সময়-অসময়ে তোকে দেখবে কে?"

সতী উত্তর দেয় না, মনে মনে বলে—'ভগবান'; যদিও সে জানে না ভগবান্ দেখিবেন কি না।

উৎসা তাহার সহ্যশীলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এক এক সময় জিজ্ঞাসা করে, "মামী-মা তোমায় বড় বলেন, দিদি—"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সতী উত্তর দেয়, "মা'র কোন দোষ নেই ভাই, মার মত অবস্থায় পড়্‌লে যে কেউ এই একই রকম কথা বলবে। মা কি বড় কম কষ্টে এত-সব কথা বলেন উৎসা?...তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে আজ প্রায় একটি বছর পড়ে আছি এখানে! মা তো আমার জন্যে সব-কিছুই ত্যাগ করেছেন;—খাওয়া-পরা সমস্ত। বাবা যখন খরচে না কুলাতে পারেন, তখন যত রাগ গিয়ে পড়ে মায়ের 'পরে।"

সে-কথা উৎসা জানে এবং তার জের তাকেও বড় কম সহিতে হয় না।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দেহে অনেক রাত্রে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া উৎসা ভাবে তাহার সেই শৈশবের কথা—যে দিন চলিয়া গেছে তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠে; তাহার চোখের জল ঝরিয়া উপাধান আর্দ্র করিয়া দেয়।

*　　*
*

মহেশ দত্ত কাল কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন, আজ তাহারই আয়োজন চলিতেছিল। পূজা শেষ হইয়া গেছে, পূজার ছুটিও ফুরাইয়াছে ;—কাল অফিস খুলিবে।

সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি এখানকার মাসিক খরচের হিসাব প্রস্তুত করিতেছিলেন, সে সময় প্রতিবেশী রাখালবাবু আসিয়া বসিলেন।

মহেশ দত্ত হুঁকাটা আগাইয়া দিলেন, রাখালবাবু তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালই যাচ্ছেন নাকি দত্ত মশাই ?"

মহেশ দত্ত উত্তর দিলেন, "কাল সকালেই যেতে হবে ; গিয়ে আবার অফিস করতে হবে। পূজোর দশটা দিন ছুটি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।"

রাখালবাবু বলিলেন, "এখানে মেয়েরা সব থাক্‌বে বোধ হয়—?"

মহেশ দত্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, উপস্থিত রইলো ; কলকাতার খরচ আর চালাতে পারছি নে মশাই, প্রাণান্ত হয়ে গেল ! আপনারা সব আছেন—ওদের দেখা-শোনা করবেন—!"

রাখালবাবু নির্ব্বাণোন্মুখ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিলেন, "সে-তো দেখতেই হবে। এ-তো আর কল্‌কাতা নয় দত্ত মশাই যে এক বাড়ীতে বাস ক'রেও কেউ কাউকে দেখে না। পাড়াগাঁয়ে ভাগ্যে সেই ভদ্রতাটা আসেনি তাই রক্ষে, তাই পাড়াগাঁয়ে একজনের কিছু হলে দশজন গিয়ে পড়ে। যাক্, মেয়েদের বিয়ের কি করছেন বলুন তো?"

শুষ্কমুখে মহেশ দত্ত বলিলেন, "কি আর কর্‌ছি!...যে দিন-কাল পড়েছে, আমার মত গরীবের পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের দু'টি মেয়ে বিবাহযোগ্যা, আবার কপাল দেখুন, ভাগ্নী পর্য্যন্ত এসে ঘাড়ে পড়েছে—সেও অবিবাহিতা! তার উপর দেখুন, একটি পয়সাও তাদের ছিল না—যাতে মেয়ে পার করতে কাজে লাগবে। একখানি কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না মশাই, এক কাপড়ে এসেছে; আমরা কাপড় দিই, তবে পরতে পায়।"

বলা বাহুল্য, এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা;—উৎসা বিনা বস্ত্রে আসে নাই।

এক একজন লোক থাকে যাহারা নিজেদের দানের কথা ব্যক্ত করিয়া লোকের নিকট হইতে বাহাদুরী পাইতে ইচ্ছা করে। মহেশ দত্ত ঠিক এই প্রকৃতির লোক ছিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়, আপনি না দেখলে—না দিলে, মেয়েটিকে দেখবে কে?...আর আপনারই তো দেখা উচিত, আপনারই ভাগ্নী, আপনি না দেখলে—না করলে,—দেখবে কে—কর্‌বে কে—?"

কথাটা শুনিয়া মহেশ দত্ত বিশেষ খুশী হইতে পারিলেন না;

বলিলেন, "ভাগ্নী হ'লেই যে করতে হবে, তার কোন কথা নেই রায় মশাই! ঐ তো আমাদের দীনু ভশ্চায—তার ভগ্নীটা না খেয়ে শুকিয়ে আম্‌সী হয়ে মামার বাড়ী এলো, মামা তাকে একটা দিন রাখতে পারলে না; যেমন এলো—তেমনই বিদায় করে দিলে। এই কি ভাগ্নীর উপর মামার কর্ত্তব্য?"

তাঁর কথার ভাবেই রাখালবাবু বুঝিলেন, তিনি খানিকটা প্রশংসা চান; বলিলেন, "কলিকাল যে, একালে কেউ কি কাউকে দেখে মশাই? ভাই দেখে না বোন্‌কে—ছেলে-মেয়ে দেখে না মা-বাপকে; মামাই যে ভাগ্নীকে দেখবে, তাই কি হ'তে পারে? শুধু দীনু ভশ্চায কেন, এ রকম অনেকেই আছে দত্ত মশাই! তাই না আমরা গাঁয়ের লোকেরা আপনাকে প্রশংসা করি; বলি—আপনি সাঁচ্চা মানুষ; আর সেই জন্যেই না বিয়ের সম্বন্ধটাও এনেছি।"

"বিয়ের সম্বন্ধ!...কি রকম—?"

মহেশ দত্ত সোজা হইয়া বসিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন, "সম্বন্ধটা খুবই ভাল, খুব ধনীঘরের একটি মাত্র ছেলে,—দেখেছেনও ছেলেটিকে;...ঐ যে আমাদের অজিতবাবুদের বাড়ীতে এসেছে, তাঁর ছেলে মোহিতের বন্ধু। শিকার করতে প্রায়ই যায় বন্দুক নিয়ে দলবল সঙ্গে করে।"

সু-দর্শন এই ছেলেটি গ্রামের সকলের দৃষ্টিই বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল,—দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টিও এড়ায় নাই।

প্রবল উৎসাহিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি—এই ছেলেটির আজও বিয়ে হয় নি? বড়লোকের একমাত্র ছেলে,

বয়েসও বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হ'ল, এখনও বিয়ে করে নি, তার মানে—?"

রাখালবাবু বলিলেন, "বড়লোকের খুশীর খেয়াল মশাই! শিকারের দিকে ভয়ানক ঝোঁক, কাজেই বিয়ে করার ইচ্ছে হয় নি; আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা যে কম চেষ্টা করেছে, তা নয়। একটি পয়সা নেবে না মশাই, হঠাৎ কাল মেয়ে দেখে ভারী পছন্দ হয়ে গেছে। আজ আমায় মোহিত এসে বললে—যাতে আপনার মত হয়—"

"মত—!"

মহেশ দত্ত আনন্দে ফুটির মত ফাটিয়া পড়িলেন।

"মত হবে না—বলেন কি মশাই!...বড়লোক, চেহারা অমন সুন্দর, নিজে সেধে বিয়ে করতে চাচ্ছে, আমায় একটি পয়সাও দিতে হবে না, আমার মত হবে না—বলেন কি? আমি এখনি বিয়ে দিতে রাজি; যেদিন তার ইচ্ছে হয়—"

বাধা দিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "যেদিন ইচ্ছা হয় বললেই তো হয় না দত্ত মশাই, আশ্বিন কার্ত্তিক দু'মাস বাদ দিতেই হবে, অঘ্রাণ মাস ছাড়া উপায় নেই।"

আনন্দের আতিশয্যে মহেশ দত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "সে একই কথা, আশ্বিন মাস তো শেষ হ'য়েই গেছে, মাঝে কার্ত্তিক, তারপরই অঘ্রাণ। বাড়ীর ভিতর খবরটা দিই, তারার যে এত বড় সৌভাগ্য হবে তা তো কেউ জানে না।"

রাখালবাবু বাধা দিলেন, "তারার কথা বলছেন যে—আমি উৎসার কথা বলছি।"

"উৎসা—"

স্তম্ভিতভাবে মহেশ দত্ত বসিয়া পড়িলেন ; "তারা নয়—উৎসা—!"

রাখালবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, উৎসাকেই অজয় বিয়ে করতে চায়, তাকেই সে কাল দেখেছে আর তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে আমায় পাঠিয়েছে।"

"অজয়—অজয় রায়—"

মহেশ দত্ত উঠিলেন,—একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন ; "ক্যাবলা, ওরে ক্যাবলা আছিস না মরেছিস, এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা !"

রাখালবাবু বলিলেন, "থাক্, তামাক আর দিতে হবে না। আমার কথার উত্তরটা পেলেই আমি যেতে পারি ; অজয়কে সে কথা জানাতে হবে কি না।"

একটু থামিয়া ধীরকণ্ঠে মহেশ দত্ত বলিলেন, "একটা কথা জানেন রাখালবাবু, বিয়ে দেওয়া বললেই তো হয় না, মেয়ে তো তৈরী ক'রে নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ওরা যেমন আমাদের মেয়ে দেখবে, আমাদেরও তো তেমনি ছেলে দেখা দরকার। ছেলের স্বভাব-চরিত্র, অবস্থা, বংশ-পরিচয়—"

রাখালবাবু বলিলে, "নিশ্চয়ই ; এ-সব তো দেখতেই হবে, না দেখে আপনারাই বা মেয়ে দেবেন কেন? ছেলে দেখুন—পরিচয় জানুন, তারপর বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তা হ'লে আমি এই কথাই তাকে বলি।"

মহেশ দত্ত অগ্নিশূন্য কলিকাতেই ধূমপান করিতে লাগিলেন।

রাখালবাবু বিদায় লইলেন।

*　*

*

উৎসার বিবাহ!

প্রথমটা দমিয়া গেলেও মহেশ দত্ত সাম্‌লাইয়া উঠিলেন।

উৎসার জন্য তাঁহাদের কিছু খরচ করিতে হইবে না, উপরন্তু যদি কিছু আদায় করিতে পারেন, এদিক্ দিয়াও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া তিনি অজয়ের বিশাল অট্টালিকা দেখিলেন, তাহার পরিচয় পাইলেন—লোভও হইয়া উঠিল দুর্নিবার।

নিজের অবস্থার কথা জানাইয়া অজয়ের নিকট হইতে যদি কিছু পাওয়া যায়;—

পাওয়াও গেল।

অজয় বিবাহের খরচের জন্য পাঁচশত টাকা মহেশ দত্তের হাতে দিল; বলিয়া দিল, 'আর যদি কিছু লাগে সে দিতে পারিবে।'

লোভ দুর্নিবার; কিন্তু বেশী লইতে লজ্জা হয়,—যদি কিছু মনে ভাবে। স্বেচ্ছায় যাহা সে দিয়াছে তাহাই ঢের।

বিবাহের দিন স্থির করিয়া মহেশ দত্ত গ্রামে ফিরিলেন; গ্রাম হইতেই বিবাহ হইবে, অজয়ের মতও তাহাই—সে কলিকাতায় থাকিয়া বিবাহ করিবে না।

বন্ধুবান্ধব তাহার বড় কম নয়, কিন্তু সে প্রস্তাব করিল,...বাড়ীতে সে কাহাকেও জানাইবে না—মা এ বিবাহ হইতে দিবেন না। এখান হইতে সে কাহাকেও না জানাইয়া একাই গ্রামে যাইবে এবং বন্ধুর বাড়ী হইতে বিবাহ করিয়া নববধূ লইয়া বাড়ী আসিবে।

মহেশ দত্তের আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, তিনি টাকা লইয়াছেন—মুখ তাঁহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া চুপি চুপি গৃহিণীর নিকটে সব কথা জানাইয়া তিনি বিবাহের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

পাড়ার ছেলে রমেশ কলিকাতায় থাকে ; বিবাহের দিন শনিবার পড়িয়াছিল, সেদিন বৈকালে বাড়ী আসিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মহেশ দত্তের বাড়ী আসিতেই তাহার সহিত দেখা হইল, তিনি তখন মহাব্যস্ত, এক মিনিট দাঁড়াইবার ফুরসুৎ নাই ; সন্ধ্যাবেলাই বর আসিবে—সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ।

"এই যে রমেশ বাবাজী এসেছো—আঃ, বাঁচলুম! তোমরা সব কর্ম্মী জোয়ান ছেলে, তোমরা থাকৃতে আমরা বুড়োর দল খেটে মর্‌বো? লেগে যাও বাবাজী—একটু কাজে হাত দাও!"

রমেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল ; বলিল, "কিন্তু কাকাবাবু, একটা কথা—"

ব্যস্ত মহেশ দত্ত বলিলেন, "এ-সময় আর কোন কথা নয়, কেবল কাজ কর। বর এখনই এসে পৌছাবে ;—কি করবো কোথায় যে যাব, কিছু ঠিক পাচ্ছিনে! তারা হচ্ছে বড়লোক মানুষ, আমাদের গরীবের কুঁড়ে ঘরে—"

রমেশ একটু হাসিয়া বলিল, "তিনি তো জেনে-শুনেই গরীবের কুঁড়ে ঘরে আসছেন গলগ্রহ নামাতে, তবে আপনার এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ কি কাকাবাবু? একটা কথা শুন্‌লুম—"

কি কথা শুনিবার ভয়েই মহেশ দত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কথাবার্ত্তা অন্য সময় হবে রমেশ, দেখছো এখন বিয়ের ব্যাপার, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিয়ে।"

তিনি কথাটাকে মোটেই আমল দিতে চান না রমেশ তাহা বুঝিল; বুঝিয়াই একটু উগ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনি যত যাই বলুন, আমি সেই বিয়ের সম্বন্ধেই যে কথা বল্‌তে এসেছি, এ কথা ঠিক। আপনি শুনতে না চান, আমি আর পাঁচজনকে ডেকে শুনাব—তারা এখনও ন্যায্য বিচার করবে।"

তাহার গম্ভীর মুখ ও উগ্র কথা শুনিয়া মহেশ দত্ত থতমত খাইয়া গেলেন; বলিলেন, "কি চাও তুমি—কি বল্‌তে চাচ্ছো বল দেখি?"

রমেশ বলিল, "বিশেষ কিছুই নয়, এই বিয়ে সম্বন্ধেই বল্‌তে চাচ্ছি—মেয়েটাকে হাত-পা ধ'রে যে জলে ফেলে দিচ্ছেন!"

"হাত-পা ধ'রে জলে ফেলে দিচ্ছি...মানে—?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে মহেশ দত্ত রমেশের পানে তাকাইলেন; বলিলেন, "তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি নে।"

রমেশ বলিল, "বুঝতে খুবই পারছেন—মানতে চাচ্ছেন না, চাইবেনও না, তাও আমি জানি। আমি উৎসার কথা বলছি; সব জেনে-শুনেও অজয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন কিছু টাকা নিয়ে, ধরতে গেলে মেয়ে বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন, এটা কি আপনার উচিত কাজ হচ্ছে?"

মহেশ দত্ত একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "যা বল্‌বে

একটু বুঝে-স্থঝে ব'লো রমেশ, যা-তা কথা ব'লো না ! টাকা নিয়েছি, মেয়ে বিক্রি ক'রেছি, এ-সব কি কথা ?"

রমেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "চেঁচালে আপনারই ক্ষতি হবে কাকাবাবু? সকলকে জানাবো আর উৎসাও শুন্‌বে—আপনি টাকা নিয়ে একজন মাতাল অসচ্চরিত্রের কাছে উৎসাকে বিক্রি করছেন! মনে রাখবেন, এতে আপনার কিছু সুযশ বাড়বে না, বরং কুৎসা গাইবে; এমন কি উৎসাও জানবে—আপনি তার জীবনটা—"

মহেশ দত্ত রমেশের হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিলেন; আর্ত্তভাবে বলিলেন, "থাক্, থাক্ রমেশ ও-সব কথা এখন থাক্! আসল কথা, আমি তিনটি কুমারী মেয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি, সুপাত্র হিসাবে অজয়কে পেলুম—বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌ছি। তুমি যে চরিত্রের কথা বল্‌ছো, তা সাম্‌লে নিতে ওর বেশীক্ষণ লাগবে না; সে আমায় কথা দিয়েছে, এখন হতে সৎ হবে—ভাল হবে। আর টাকা নেওয়ার কথা বল্‌ছো,—আমি গরীব জেনে অজয় বিয়ের খরচ চালাতে আমায় কিছু টাকা দিয়েছে—উৎসার বিক্রি-মূল্য নয়।"

রমেশ চুপ করিয়া রহিল।

মহেশ দত্ত আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমার অবস্থা তো জান বাবাজি, —মাস গেলে সামান্য টাকা মাইনে পাই, তাতে যে কি কষ্টে দিন চলে সে আমিই জানি। এর মধ্যে থেকে বিয়ের খরচ চালানো যে কি কষ্টকর তা তোমরা বুঝবে না, যে চালায় কেবল সেই বোঝে। তোমার হাতে ধরছি বাবাজি, এ-সব নিয়ে আর গোলমাল করবে না।"

রমেশ সত্যই গোলমাল করিল না।

বর আসিল—সঙ্গে আনিয়াছিল গহনা-পত্র; বিবাহের পূর্ব্বে সে-সব গহনা উৎসাকে পরাইয়া দেওয়া হইল।

মামী-মার চোখ দুইটি জ্বলিতে লাগিল, পাড়ার মেয়েরা শতমুখে উৎসার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল—মামী-মা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

তাঁহার কন্যা কয়টি আজও অবিবাহিতা; উৎসার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও তাহাদের বিবাহ হইল না, উৎসার বিবাহ হইয়া গেল! কেন তাঁহার মেয়েরা সুন্দরী হইল না—কেন তাহারা কালো হইল?...

উৎসার বিবাহ হইয়া গেল—

মহেশ দত্ত একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

যে যাই বলুক, আর কেহই এ বিবাহে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না।

পরদিন উৎসা স্বামীর সহিত স্বামীর আলয় কলিকাতায় যাত্রা করিল।

মামী-মা আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"সুখে থাকো মা, রাজরাজ্যেশ্বরী হও! দেখো মা, বড়লোকের বাড়ীর বউ হয়ে যেন আমাদের ভুলে যেও না—গরীব মামা-মামীকে এক একবার মনে ক'রো!"

উৎসা সতীকে প্রণাম করিল—

সতী অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমাদের মনে রেখো উৎসা—পত্র দিও! জানি—তুমি আর ফিরবে না; তবু তোমার পত্রে তোমার খবরটা পেলেও সুখী হবো।"

উৎসা চোখ মুছিয়া বলিল, "দুই মাস পরে আমি যদি তোমায় আমার ওখানে নিয়ে যাই দিদি,—বল, তুমি যাবে?"

সতী মলিন হাসিল;—

"তাই কি হয় পাগ্‌লী!....লাথিই খাই আর ঝাঁটাই খাই, তবু এ আমার বাপের বাড়ী,—কারও একটা কথা বলবার অধিকার নেই। তোমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকা আমার পক্ষে গৌরবের নয় দিদি—!"

সতী অজয়ের কথা শুনিয়াছিল,—রমেশ তাহাকে চুপি-চুপি সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছিল।

সতী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল—"অভাগিনী উৎসা যেন সুখী হয় ভগবান,....উৎসাকে অসুখী ক'রো না···!"

*   *

*

বিনয় কলিকাতায় ছিল না, ছয় মাসের জন্য সে অফিসের কাজে সিমলায় গিয়াছিল; যাইবার আগে উৎসার নামে একখানা পত্র লিখিয়াছিল, সিমলা হইতেও দু'-তিনখানা পত্র লিখিয়াছিল—কোনটাই উৎসার হস্তগত হয় নাই, সে জন্য উৎসা পত্র দিতে পারে নাই।

ছয় মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়াই বিনয় উৎসার সঙ্গে দেখা করিতে মহেশ দত্তের বাড়ীতে গেল।

বাড়ীতে কেহ নাই—শূন্য ঘর পড়িয়া আছে। সন্দেহাকুল-মনে বিনয় পাশের বাড়ীর লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, মহেশ দত্ত তের নম্বর বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছেন—এখানে থাকেন না।

তের নম্বর বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ; কড়া নাড়া দিতে কে ভিতর হইতে হাঁকিল,—"কে?"

বিনয় জবাব দিল, "দরজাটা খুলে দেখুন!"

দরজা খুলিয়া দিল মহেশ দত্তের বড় ছেলে পরেশ; বিনয়কে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই মশাই, কোথা হ'তে আসছেন—আপনার নাম—?"

বিনয় বলিল, "সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে; প্রথম কথা, আমাকে চিনেও না চেনার ভাণ করার কারণ আমি বুঝছি নে, সেই প্রশ্নটার উত্তর দিলেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিল্‌বে।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আমি আপনাকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না মশাই; কোথায় দেখেছি বলুন তো,...কোথায় আলাপ হয়েছিল...?"

অধৈর্য্যভাবে বিনয় বলিল, "সে কথার উত্তর দেওয়া। সময় আমারও নেই মশাই! আপনি উৎসাকে চেনেন তো,—না তাকেও চিনতে পারবেন না? তাকে ডাকুন দেখি, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

পরেশ বলিল, "উৎসা...? সে তো এখানে নেই,—এখানে থাকে না।"

বিনয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "নেই—থাকে না, মানে কি মশাই? আমি তাকে ছয় মাস আগে এখানে —আপনাদের কাছে রেখে গেছি, আজ আপনি একেবারে আকাশ হ'তে পড়ছেন যে? ডাকুন আপনার বাবা মহেশ দত্তকে, আমার যা কথাবার্ত্তা তাঁর সঙ্গে হবে।"

পরেশ বলিল, "চটেন কেন মশাই? বাবা যে এমন সময় বাড়ী থাকেন না—অফিসে থাকেন, এ কথা সবাই জানে। আপনি বরং সন্ধ্যের দিকে আস্‌বেন, সেই সময় তাঁর কাছে উৎসার খবর পাবেন।"

সে বিনয়ের মুখের উপরেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ইহার অভদ্র ব্যবহারে বিনয় রুষ্ট হইল কম নয়, কিন্তু উপায় নাই।

ফিরিয়া গিয়া সে এ-দিক্ ও-দিক্ হইতে বৈকালের মধ্যেই উৎসার বিবাহের কথা জানিয়া ফেলিল। প্রতিবাসীরাই জানাইয়া দিল, কৃপণ ও

স্বার্থপর মহেশ দত্ত টাকা লইয়া সুন্দরী ভাগিনেয়ীটির কোন এক বড়লোকের সহিত বিবাহ দিয়াছে।

বড়লোকের নাম জানিতেও বিলম্ব হইল না।

অজয়ের নাম শুনিয়া বিনয় কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অজয়কে সে চেনে—চিনিয়া ঘৃণা করে; একদিন অজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা তাহার ছিল, সেদিন সে অজয়কে এ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিছুতেই না পারিয়া সে দারুণ ঘৃণায় অজয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছে।

সেই অজয়—ঘৃণিত জীবনযাপন করিতে যে চির-অভ্যস্ত, সেই অজয় হইল—উৎসার স্বামী...!

বিনয় প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বুকের পকেটে হাত পড়িতেই সরিতের পত্রখানা খড়খড় করিয়া উঠিল। আজ কয়েকদিন হইল মাত্র পত্র আসিয়াছে—সরিত উৎসাকে বিবাহ করিতে চায়।

সে লিখিয়াছে—কথাটা সে পিতামাতাকে জানাইয়াছে, যদিও তাঁহাদের উপস্থিত মত হয় নাই, তথাপি কোন দিন যে মত হইবে সে বিষয়ে সরিতের সন্দেহ নাই। সরিত এতদিন ধরিয়া অনেক ভাবিয়াছে, অবশেষে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে—উৎসাকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বিনয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—

কোথায় উৎসা...?

আজ উৎসা কুমারী নয়, সে বিবাহিতা; সরিতের জীবন ব্যর্থ

হইয়া গেল—সফলতা লাভ করিতে পারিল না; হয় তো কোনদি৹ পারিবেও না।

মহেশ দত্তকে দু' কথা শুনাইয়া দিবার লোভ সে ছাড়িতে পারে নাই, তাই সে সন্ধ্যার পরে আবার তের নম্বর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

রুদ্ধ দরজায় কড়া নাড়া দিতেই এবার দরজা খুলিয়া দিলেন মহেশ দত্ত নিজে। মনে হয় তিনি বিনয়ের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন; সে যে আবার আসিবে সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

দৌহিত্রীর ছয়হাতি একখানি শাড়ী কোন রকমে তিনি বিশাল উদরে আঁটিয়া কষিয়া পরিয়াছেন, বাঁ-হাতে কড়ি-বাঁধা ছোট গোল হুঁকাটি।

দক্ষিণ হস্তস্থিত লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "ও, তুমি...? পরশু তো নামই বল্‌তে পারলে না। এসো, এসো বাবাজী—বসবে এসো!"

বিনয় নম্রভাবে বলিল, "না, বস্‌বার দরকার হবে না, আমি দাঁড়িয়েই দু'টো কথা বলে যেতে চাই।"

কি কথা তাহা জানিয়াও অজ্ঞের ভাণ করিয়া মহেশ দত্ত বলিলেন, "কথাটা কি?"

বিনয় বলিল, "শুনলুম, উৎসার বিয়ে হয়েছে,....আর সে বিয়ে হয়েছে —মাতাল লম্পট অজয়ের সঙ্গে? আপনি উৎসার মামা হয়ে সব জেনে শুনে তাকে এমন লোকের সঙ্গেও বিয়ে দিলেন?"

মহেশ দত্ত স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "আস্তে, বাবাজী—আস্তে; সুপাত্র

পেয়েছি—দিয়েছি। গরীবের মেয়ে—বিয়ে হয় না, বড়লোকের ঘরে যে পড়েছে এই তার অনেক পুণ্যের ফল।"

বিনয় বলিল, "নিশ্চয় ; কিন্তু এই পুণ্যের ফল যে কি, তা আপনিও জানেন—আমিও জানি। আপনি উৎসাকে শেষকালে বিক্রী করলেন একটা চরিত্রহীনের কাছে—?"

মহেশ দত্ত রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "বাড়ী বয়ে এসে যা তা কথা বলতে এসো না বিনয়! আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি; তাতে কারও কথা বলার অধিকার তো নাই। আমি তার মামা, আমায় তার একমাত্র অভিভাবক জেনেই যে তুমি তাকে আমার কাছে এনেছিলে?...আজ আমি যা খুশী করলেও তুমি কোন কথা বলতে পার না বিনয়!"

বিনয় মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি তাকে বোনের মত দেখতুম বলেই তার মন্দ হলে আমার বুকে লাগে!..আচ্ছা, আমি আসি, এর পর আর একদিন দেখা কর্‌বো।"

মহেশ দত্ত তাহাকে ছাড়িতে চান না—"সে কি হয় বাবাজী, কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা, এলেই যখন, একটু বসো—জল খেয়ে যাও—!"

বিনয় শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আজ থাক্, আর একদিন হবে।" সে বাহির হইয়া পড়িল।

* *

*

শ্বশুরালয়ে বধূ উৎসা—।

দিন তাহার এক রকম করিয়া কাটে।

সুখে তো নয়ই ;—কোন দিক দিয়াই সে সুখী নয়।

প্রথম যেদিন উৎসা স্বামীর সহিত এখানে পদার্পণ করিল, সেই দিনই সে বুঝিয়াছিল কোথায় ও কিরূপ অবস্থার মধ্যে সে আসিয়াছে।

সংসারে ছিলেন অজয়ের মা।

অল্পভাষিণী মা, সংসারের সঙ্গে একদিন তাঁহার সংস্পর্শ গভীরতম ছিল, পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা মাতা বিডন ষ্ট্রীটে অন্য আলয়ে বাস করিতেছিলেন, অজয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্পর্শ ছিল না।

অজয় স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিয়াই মাকে আনিতে গেল। মা অভিমান করিয়া বলিলেন, "আমার তো কোন দরকার নেই যাওয়ার অজয়! তোমার সংসার—তোমার স্ত্রী, তুমি এখন যা হয় কর গিয়ে।"

শেষ পর্য্যন্ত পুত্রের জিদে তাঁহাকে আসিতে হইল।

পুত্রবধূকে দেখিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন,—এবার হয় তো গৃহত্যাগী পুত্রের গৃহে মন বসিবে।

উৎসা শূন্য গৃহে আসিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, শাশুড়ি আসিতে সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রথমটায় সে বুঝিতে পারে নাই—এত বড় বাড়ী শূন্য কেন,—দাস-দাসীর একছত্র রাজত্ব, বাড়ীর লোক কেহ তাহার সম্বর্দ্ধনা করে না কেন!....

অজয় মাকে আনিতে গেলে তাহার নিকটে ছিল তাহারই দূর-সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া,—উপস্থিত তিনিই কর্ত্রীস্থানিয়া হইয়াছিলেন।

ইহারই মুখে উৎসা শুনিতে পাইল—অজয়ের মা অজয়ের ব্যবহারে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ভ্রাতৃ-আলয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

উৎসা শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কি রকম ব্যবহার করেছেন?"

আত্মীয়া মুখ বক্র করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওই যে বলে—'এক ব্যান্নন নুণে ভরা', অজয়ের মায়েরও হয়েছে তাই। একটিমাত্র ছেলে—যতদূর হতে হয় খারাপ সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গেছে। বলব কি মা, বাড়ীতে সেই সব নাচওয়ালী মেয়েদের আনতো, মদ খেয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ করতো। তাই নিয়ে হ'ত মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, মা তাই রাগ করে চলে গেছেন।"

"মাতাল!—অসচ্চরিত্র!..."

উৎসা যেন আকাশ হইতে ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

অনেক সুখেরই কল্পনা করিয়াছিল সে, একটি দমকা-বাতাসের স্পর্শ লাগিতেই তাহার বড় কষ্টে তৈয়ারী তাসের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

শাশুড়ীর অজস্র আদর, স্বামীর স্নেহ, ভালবাসা তাহার মনের আঘাতের ব্যথা মিলাইতে দিল না।

এই তাহার স্বামী;—আবার হয় তো কোন দিন ফেলিয়া-আসা

পথে ফিরিয়া যাইবে, সে দিন উৎসা অনেক ডাকিয়াও তাহার সা।। পাইবে না।

অজয় আদরে—সোহাগে, যত্নে উৎসাকে একেবারে অতিষ্ট করিয়া তুলিল, উৎসার মনে হইল—এ সবই মৌখিক।

অজয় ক্রমেই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল,—সে উৎসাকে কোথাও যাইতে দিবে না, দিনরাত্রি নিজের গৃহে বসাইয়া রাখিবে।

এই রকম সময়ে বিনয় সরিতকে সঙ্গে লইয়া উৎসার সহিত দেখা করিতে আসিল।

উৎসাকে দেখিয়া বিনয় সুখী হইতে গিয়া সুখী হইতে পারিল না। তাহার মনে হইল—এ যেন প্রাণহীন প্রতিমা। সে দরিদ্রা উৎসাকে প্রাণময়ী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল—এ উৎসা যেন তাহারই ছায়া মাত্র।

ধীরপদে উৎসা আসিয়া দাঁড়াইল—সরিত ও বিনয়কে প্রণাম করিল।

সর্ব্বালঙ্কৃতা উৎসার পানে তাকাইয়া সরিত গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া উৎসা বলিল, "ভাল আছ বিনয়-দা? এত-দিনের মধ্যে একটি দিন আর খোঁজ নিলে না—বাঁচলুম কি মরলুম!"

বিনয় শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "মিথ্যা অনুযোগ দিদি! আমি সিমলা যাওয়ার আগে দেখা করতে গিয়ে তোমার মামার কাছে শুনলুম তোমরা কালীঘাটে গিয়েছ; আর একদিনও গিয়ে শুনলুম, তুমি কোথায় গিয়েছ। সিমলা গিয়েও চার-পাঁচখানা পত্র দিয়েছি, একখানারও

উত্তর পাইনি; তারপর পরশু এখানে এসে তোমায় খুঁজে সারা হয়ে গিয়েছি।"

উৎসা বলিল, "মামা নাকি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন।"

বিনয় বলিল, "অনেক কষ্টে নূতন বাসায় গিয়ে খোঁজ নিলুম; প্রথমবারে তোমার মামার ছেলে আমায় চেনে না বলেই হাঁকিয়ে দিলে, রাত্রে গিয়ে খোঁজ পেলুম তোমার মামার। রাগের চোটে দু'টো কথা শুনিয়ে দিয়েছি, আরও বলার ইচ্ছে ছিল, হয়ে উঠ্‌লো না।"

উৎসা নতমুখে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিল; শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "মামার কোন দোষ নেই বিনয়-দা, দোষ আমার ভাগ্যের—আমার অদৃষ্টের!"

অসহিষ্ণু সরিত বলিল, "অদৃষ্ট—ভাগ্য, এ-সব কথাগুলো নেহাৎ বাঁধা গৎ মাত্র; অদৃষ্ট মানুষেই তৈরী করে—দেবতা নন্। তোমার অদৃষ্টই নূতন ক'রে তৈরী হতে পারতো, যদি—"

উৎসা শান্তকণ্ঠে বলিল, "পার্‌তো না সরিত-দা—কিছুতেই পার্‌তো না! জিদ্ ক'রে আপনি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না; ও যা ঘট্‌বার তা ঘট্‌বেই, কেউ তা হতে বাঁচাতে পার্‌বে না—বাঁচাতে কাউকে পারা যাবে না। জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ এ তিনটির উপরে মানুষের হাত চলে না—চল্‌বেও না।"

সরিত জিদ্ করিয়া বলিল, "চল্‌ছে বই কি উৎসা! তুমি জান না তাই বলছো চলতে পারবে না। মানুষের জন্ম। আর বিবাহ নিয়ন্ত্রণ সুরু হয়েছে মানুষেরই হাত দিয়ে, মৃত্যু আজও না হ'লে ও হবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

উৎসা স্থির-নেত্রের দৃষ্টি সরিতের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি বল্‌তে পারি নে সরিত-দা, আমার বুদ্ধি সামান্য, জ্ঞানও সামান্য, খুব বড় বড় বিষয় ধরার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি যা বুঝি তাতে বলতে পারি, মানুষ একদিক দিয়ে যত খুশীই বজ্র আঁটুনি দেওয়ার চেষ্টা করছে, সে সবই হাল্কা গেরো হয়ে যাচ্ছে। জন্ম আর বিবাহে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে বলে আজ যে মানুষ অহঙ্কার কর্‌ছে, আমি বলবো, সেই অহঙ্কারের হেতুটাই তার মনকে চোখ ঠারা মাত্র। মানুষ যদি দেবতার বিধান রদ্ করতে পারতো, তা হ'লে কেন হয় আজও দেশে দুর্ভিক্ষ—মহামারী, কেন হয় ভূমিকম্প—প্লাবন? যেগুলো মানুষ চেষ্টা কর্‌লে প্রতিবিধান কর্‌তে পারে, তা না করে মানুষ চায় জন্ম মৃত্যু বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে; আর কদাচিত একটা দু'টো সম্ভবপর হ'য়ে গেলে তাই নিয়ে করে দর্প—অহঙ্কার, তাই নিয়ে চলে বুক ফুলিয়ে।"

সরিত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আজ মানতে চাইছো না উৎসা, কিন্তু একদিন মানতে হবে, মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি আছে কিনা, আর তা নিয়ে ঠিকমত কাজও তারা কর্‌ছে কিনা। একটা দিন ছিল, যখন মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতেই হ'তো, আজ দেখ্‌ছো অনেক মেয়ে কুমারীভাবে থেকেও জীবন কাটিযে যায়। অতটুকু বয়সে বিয়ে দেওয়াও আজকাল নিন্দের কথা হয়েছে। এই বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জন্মকেও নিয়ন্ত্রিত করা হ'লো না কি?"

উৎসা চুপ করিয়া রহিল; এ-সব বিষয়ে জ্ঞান তাহার খুবই কম,

পল্লীর মেয়ের বিদ্যা এত বেশী নয়,—যাহার সাহায্যে এ বিষয় লইয়া বেশী তর্ক করিতে পারে।

বিনয় বলিল, "এ-সব তর্ক একদিন তোমার সঙ্গে আমার চল্‌বে সরিত,—আমি তোমায় কথা দিয়ে রাখ্‌ছি। উৎসার সঙ্গে আর কয়েকটা কথা বলে নেওয়া যাক্‌। শ্বশুরবাড়ীর বউ, আগেকার মত অসঙ্কোচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বলা তো চল্‌বে না, এখন সবই সীমাবদ্ধ; কি বল উৎসা—"

তাহার পরিহাসপূর্ণ কথায় উৎসা হাসিতে গেল, কিন্তু হাসি ফুটিল না,—কেবল মুখটাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র।

সরিত জিজ্ঞাসা করিল, "অজয় বাড়ী নেই?"

উৎসা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনারা তাঁকে চেনেন বুঝি?"

বিনয় বলিল, "একটু-আধটু চেনা আছে বৈ-কি;—এককালে এক সঙ্গে পড়েছিলুম কিনা!"

উৎসা উত্তর দিল না।

বিনয় বলিল, "কিন্তু সে জন্যে তোমার কুণ্ঠিত হওয়ার বা লজ্জা পাওয়ার কোন কারণই তো নেই উৎসা! তোমার অনেক আগে হতে অজয়কে আমরা চিনি;—বিশেষ ক'রে আমি যতটা চিনি, সরিত অতটা চেনে না।"

উৎসা শূন্যদৃষ্টিতে বিনয়ের পানে তাকাইল; বলিল, "লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ থাক্‌লেও আমি লজ্জা পাচ্ছিনে বিনয়-দা! আমি অদৃষ্ট মানি; আমি জানি, আমার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা ঘট্‌বেই, কিছুতেই কেউ তার অন্যথা কর্‌তে পার্‌বে না।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "মামা যা করেছেন তা আমার ভালোর জন্যই করেছেন সে কথা আমি বলবো। তার পর আমার অদৃষ্টক্রমে যদি খারাপই হয়ে থাকে, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর বিনয়-দা, আমি যেন সে খারাপকে ভাল করে নিতে পারি। তোমাদের আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে আমি সব পারবো বিনয়-দা...!"

তাহার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে বিকৃত হইয়া উঠিল।

বিনয় তাহার মাথার উপর হাতখানা রাখিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমি জানি—তুই আমায় নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখিস্ উৎসা! তোর মা তোর ভার আমায় দিয়ে গেছেন। নিজের কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটিতে আমি নিজেই লজ্জিত বোন! তবু আমার যদি আজও বড় ভাই বলে মেনে থাকিস্—শ্রদ্ধা করিস্, আমি আশীর্বাদ করি, তোর একান্ত নিষ্ঠাই অজয়কে সৎ করবে—তাকে মানুষ করবে—তুই সুখের সংসার পাততে পারবি....!

উৎসার চোখ দিয়া নিঃশব্দে দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

*

*

শরীর ভাল নয়—মাঝে মাঝে প্রায়ই জর হয়; সরিত দীর্ঘ তিন মাসের ছুটি লইয়া আবার গ্রামে ফিরিল।

সতীশবাবু ইদানীং গ্রামেই বাস করিতেছিলেন,—মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া কাজ দেখিতেন মাত্র।

আনন্দবাবুও মাসখানেক আগে গ্রামে আসিয়াছেন। মৃণাল কলিকাতার বাড়ীতে থাকিত, প্রতি সপ্তাহে শনিবারে বাড়ী আসিয়া সোমবারে কলিকাতায় ফিরিত। এ সপ্তাহে সে আসিতে পারে নাই, তাহার এম্-এ এক্জামিন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনা লইয়া সে এখন মহাব্যস্ত।

সরিতের শীর্ণ আকৃতির পানে তাকাইয়া মা চোখ মুছিলেন,—"কি চেহারাই হয়েছে সরিত, তবু তো ছুটি নিয়ে দেশে আসতে চাস্ নে? ভাগ্যে উনি এবার গিয়ে জোর করে ধর্‌লেন তাই ছুটি নিলি, নচেৎ তো ওখানেই পড়ে থাক্‌তিস।"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল, "এমনই বা কি রোগা হয়ে গেছি মা! ম্যালেরিয়া ধরেছে—দু' চারবার জর হয়েছে মাত্র। ম্যালেরিয়া কি কারও হয় না—কেউ কি ভোগে না?"

উমাদেবী রাগ করিয়া বলিলেন, "হয়,—কিন্তু তারা চিকিৎসা করে।"

সরিত বলিল, "এর আর চিকিৎসা কি? ডাক্তারের ব্যবস্থা—শুধু কুইনাইন খাও;—তা দিন তিনটা করে ট্যাবলেট খাচ্ছি মা, তাতে যদি জ্বর বন্ধ না হয়, আমি কি করবো বল দেখি?"

ভগিনী বেলা সম্প্রতি শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছিল; সে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া আট মাসের শিশু-পুত্রকে দুধ খাওয়াইতেছিল, এতক্ষণে তাহার হাতের কাজ শেষ হইল। ছেলেকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া সে বলিল, "কি আর করবে দাদা!...কতদিন হতে বলছি, 'একটা বিয়ে করে ফেল; তা তো করবে না'! মাকেও বলছি—'বাপু, একটা বিয়ে দিয়ে বউয়ের হাতে ছেলের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসো; দেখ, ওষুধ খাওয়ানো হয় কিনা, আর দাদা'রও শরীর ভাল হয় কিনা'!"

সরিত তাহাকে তাড়াইয়া গেল;—"খালি বিয়ে আর বিয়ে!...বিয়ে ছাড়া তোর মুখে আর কোনও কথা নাই বেলা? নিজে বিয়ে করে ঠকেছিস্ তাই এখন সকলকেই ঠকাতে চাস্, না?"

বেলা মুখ বক্র করিয়া বলিল, "হ্যাঁ—ঠকেছি, তাই তোমাকেও ঠকাতে চাচ্ছি। এত দিন ধরে বিয়ের সম্বন্ধ আনলুম, একটা পছন্দ হ'ল না! কোন্ স্বর্গের অপ্সরী এনে দিতে হবে বল দেখি? বাপ রে, এদিকে ঠক্ বাছতে গাঁ যে উজোড় হয়ে গেল, তবু মনের মত বউ পেলে না!"

সরিত বলিল, "যা-সব মেয়ে এনেছিলি!....কোনটা টেরা, কোনটা

বোবা, কোনটা খোঁড়া, কোনটা খোনা, বেছে বেছে যা-সব মেয়ে এনেছিলি বেলা…!"

বেলা বলিল, "আচ্ছা, এবার ভাল মেয়ে তোমায় এনে দেব, পছন্দ নিশ্চয়ই হবে,—তা আমি বলে দিচ্ছি…!"

সরিত বলিল, "আগে পাত্রীটির পরিচয় পাই,—তিনি অপ্সরী কি বিদ্যাধরী আগে দেখি, তারপর তো বিয়ের কথা ভাববো।"

বেলা বলিল, "সে তোমার চেনাশোনা মেয়ে;…আমাদের আনন্দবাবুর মেয়ে মৃণাল…।"

সরিত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

এ কল্পনা সে কোনদিনই করে নাই। মৃণালকে সে চেনে, অনেক দিন মৃণালের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে,—অনেক বিষয়ে অনেক আলোচনা চলিয়াছে, তবু সে কোন দিনই মৃণালকে বিবাহ করার কল্পনা করিতে পারে নাই।

মৃণাল অনেক উপরে—নাগালের বাইরে, চাঁদের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। চাঁদ দেখিতে ভাল লাগে, কিন্তু চাঁদকে ধরা চলে না—সেই জন্যই চাঁদকে পাইতে কেহ চায় না। শিশুরা চাঁদ দেখিতে ভালবাসে, যতদিন অবুঝ থাকে ততদিন চাঁদকে পাইতে চায়,—তাহার পর নিজেরাই সান্ত্বনা পায়।

সরিতকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বেলা একটু হাসিল; বলিল, "কি রকম, এবার মত হবে নিশ্চয়ই; এবার আর না বলতে পারছো না।"

সরিত গম্ভীরমুখে বলিল, "কি যা-তা বলছিস্ বেলা। মৃণাল এম্-এ একজামিন দিচ্ছে জানিস্?…এম্-এ পাশ ক'রে সে আসবে

তোদের ঘরের বউ হতে—এ কামনাও সম্ভব হতে পারে? তোদের স্পর্দ্ধা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই বেলা! আমার এতটা সাহস কোন দিনই হয়নি যে, মৃণালকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করার কথাটাও ভাব্‌বো।"

উমাদেবী বলিলেন, "তোরা ঝগড়া করিসনে বাপু, যা বলবার আমি বল্‌ছি! শোন সরিত, আনন্দবাবুর সঙ্গে ওঁর এ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়েছে, আনন্দবাবুর তোকে জামাই করতে এতটুকু আপত্তি নেই। তিনি বলেছেন, যদি তোর আর মৃণালের মত হয়, তিনি তার এক্‌জামিনের পরেই বিয়ে দিবেন।"

সরিত একটু হাসিল,—"বিয়ে দেওয়াও সোজা—করাও সোজা, তবে কথা হচ্ছে—নিজেরা তো মা সরস্বতীর বরপুত্রী,—বাংলা ছাড়া আর দ্বিতীয় ভাষা জান না, এম্‌-এ পাশ বউ এসে যখন ইংরেজীতে কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে, তখন কি করবে বল দেখি?"

বেলা রাগ করিয়া বলিল, "এম্‌-এ পাশ মেয়েরা তাদের মাতৃভাষা একেবারে ভুলে যায়,—না? তুমি আর হাড়-জ্বালানি কথাগুলো বলো না দাদা! মৃণালকে আরও যদি না দেখতুম্‌ না চিনতুম্‌, তাও না-হয় বল্‌তে পারতে! মাও ত একদিন দেখেছো তাকে,—বল তো কি লক্ষ্মী আর কি শান্ত মেয়ে! লোকে যে বলে, 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী', ঠিক তাই;—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কেউ দেখে বলতে পারবে না, সে অত লেখাপড়া জানে,—কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে এতটুকু বুঝতে পারা যায় না।"

বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া সরিত বলিল, "ওই অতি ভাল মানুষটির ঠেলাই বোঝা যাবে যখন তিনি বধূরূপে কোন গৃহস্থ ঘরে

উঠবেন। বাপ রে, এই সব অতিশিক্ষিতা মেয়েদের দিকে চাইতে আমার ভয় হয়—আমার বুক কাঁপে,...পাছে কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলি! আর বুঝলে মা, না-হয় নাই বললে ইংরাজী কথা, তুমি কি মনে কর, এম্-এ পাশ মেয়ে এসে ঠিক তোমার মনের মত ঘরের বউ হয়ে থাকতে পারবে? জীবনের এতটা দিন যাদের কেটেছে বাইরে পাঁচজনের মাঝখানে—অবাধ মেলামেশার মধ্যে দিয়ে, তারা গৃহস্থ-বধূর জীবনযাপন করতে সমর্থ হবে কিনা সেটা ভেবেছো কি?"

শঙ্কিতভাবে উমাদেবী বলিল, "গৃহস্থের ঘরের বউয়ের জীবন কি এমনই বদ্ধ সরিত?"

সরিত উত্তর দিল, "তোমাদের কাছে প্রীতিপ্রদ হলেও তাদের কাছে নিশ্চয়ই। তোমরা বউ আনবে, চাইবে—তোমাদের বউ লজ্জাশীলা, মধুহাসিনী—মধুরভাষিণী হোক্, চাইবে—তোমাদের বউ সেবাপরায়ণা, লক্ষ্মীপ্রতিমা হোক; কিন্তু যে মেয়ে এম্-এ পাশ দিয়ে আসবে, প্রথম কথা,—লজ্জার আড়ষ্টতা তার মধ্যে নেই, কাজেই সে ঘোমটা টানবে না—কাজকর্ম্মে সেবায়-যত্নে সে অনভ্যস্তা, তাই পারবে না তোমাদের সেবা করতে—রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতে; তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে তোমরা ক্ষুণ্ণ করতে পারো না;—তাই সে ইচ্ছামত তার পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে যদি সিনেমায় যায়, যদি ফুটবল খেলা দেখতে যায়, যদি থিয়েটারে যায়—"

বেলা একেবারে কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—"মাগো, দাদা কি যে বলে ঠিক নেই!"

সরিত জোর করিয়া বলিল, "খুবই ঠিক আছে, বাস্তবিক যা, আমি তাই বল্‌ছি। তোরা চাইবি সেকালের আদর্শে শিক্ষিতা বউ, কিন্তু আমরা বর্ত্তমান শিক্ষার মানুষ—পাশ্চাত্যের সভ্যতায় অনুপ্রাণিত, আমরা চাইব না কেউ কারও অধিকার খর্ব্ব করতে,—না স্বামী, না স্ত্রী।"

বেলা বলিল, "তাই বলে বউ যদি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সিনেমায়, থিয়েটারে যায়, তোমার মনে কষ্ট হবে না?"

সরিত আবার হাসিল; বলিল, "ঐটুকু সঙ্কীর্ণতা রাখব না;—বউও না—আমিও না। তা হলে আমাদের সমানাধিকার দেওয়ার বা নেওয়ার মানে রইলো কি?"

বলিতে বলিতে উমাদেবীর পানে তাকাইয়া সে বলিল, "দরকার নেই মা, এম-এ পাশ বউ এনে,—গৃহস্থ ঘরে ও বউ মানাবে না, ও বউ শো-কেসে তুলে রাখা চলে—গৃহস্থালীর কাজে পোষাবে না। দু'দিন না খেয়ে থাকলে ও বউ রান্নাঘরে যেতে পারবে না; বলবে, 'বাজারের বা হোটেলের খাবার এনে খাও'! একে তো ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরছি, তার উপর বাজার বা হোটেলের খাবার খেলে আর একটি দিনও যে বাঁচতে হবে না, তা বলে দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উমাদেবী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু যদি মৃণাল রাজি হয়, আমি তাকে দিয়েই দেখাব—এ সব মেয়েদের সম্বন্ধে তুই যা ধারণা করে রেখেছিস্ সরিত, সে সব মিথ্যা। ব্যতিক্রম হিসাবে দু'-একটি মেয়ে থাকলেও সকলকে এই পর্য্যায়ে ফেলা চলে না—

এ কথা তোকেও বলে দিচ্ছি। এম্-এ পাশই হোক্ আর যাই হোক্, সে যে এ দেশের মেয়ে, বাঙ্গলার আবহাওয়ায় যে পুষ্ট হয়েছে, সে যে তার স্বামী-পুত্র না খেতে পেলে হোটেল বা দোকানের খাবারের ব্যবস্থা করবে, তা মনে করিস্ নে। যদিও তারা না জানে, তবু তারা যত্ন করে শিখবে। যারা অত কষ্ট করে অত বিদ্যা আয়ত্বে আন্‌তে পেরেছে, গৃহস্থালীর সামান্য কাজকর্ম্ম আয়ত্বে আনা তাদের পক্ষে যে কষ্টকর হবে না, তা আমি জানি। আমি তোকে বলে রাখছি সরিত, যদি মৃণাল রাজি হয়, দেখবি ঐ মৃণালকেই আমি ঘরের লক্ষ্মী করে গড়ে তুল্‌বো।"

সরিত কি একটা কথা বলিবে ভাবিয়া মুখ তুলিয়া মায়ের দৃপ্তোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া নীরব হইয়া গেল।

*   *
*

পরীক্ষা দিয়াই মৃণাল গ্রামে ফিরিল।

পিতাকে প্রণাম করিতে, তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ; সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন একজামিন দিলি মিনু—?"

মৃণাল উত্তর দিল, "মন্দ দিই নি বাবা ; তারপর কি হবে কে জানে ?"

তাহার পরই একটু হাসিয়া বলিল, "আর পাশ করলেও যা, ফেল করলেও তা, ..আর পড়্‌ছি নে বাবা ! সে দিন ইউনিভার্সিটিকে নমস্কার করে বার হয়েছি, বলেছি—আর যেন এ দরজা ডিঙাতে না হয়।"

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পিতা সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন, "খুব লক্ষ্মী মেয়ে দেখছি....একেবারে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছিস্ !"

মৃণাল বলিল, "আর কি ভাল লাগে বাবা !"

পিতা বলিলেন, "বেশ তো....এবার বুড়ো বাপের সেবা-যত্ন কর ঘরে বসে, সংসারের কাজ-কর্ম্ম শেখ! এ-গুলোও তো শিখতে হবে মা!"

মৃণাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "রান্না করা আমি শিখেছি বাবা! সেদিন আমরা 'পিক্‌নিক্‌' করেছিলুম, তাতে আমিই রান্নার ভার নিয়েছিলুম। খেয়ে সকলেই কিন্তু ভারি সুখ্যাতি করেছিল।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই করবে তা আমি জানি। এবার আমায় একদিন রেঁধে খাওয়াবি কিন্তু, তোর রান্নার নিমন্ত্রণ রইলো।"

মৃণাল ঘর গুছাইতে মন দিল।

সুশীলা এখানেই রহিয়াছেন, পুত্র-কন্যাও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে।

মৃণালকে দেখিয়া নিশানাথ ভারি খুশী হইয়া উঠিল;—সে মৃণালকে একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, মাঝে মাঝে পয়সাটা আনিটা মৃণালের নিকট হইতে পাওয়া যাইত, সেজন্য সে একটু কৃতজ্ঞও ছিল।

সুশীলা বলিলেন, "ঘর-দোর সবই গুছানো আছে বাছা, এ আর কেউ নয়—নিজে আমি। ঝি-চাকরদের এতটুকু ফাঁকি দেওয়ার যো নেই, দিন-রাত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেই। তোমাদের বেলায় বাছা ওরা নড়ে বসতো না,—যেন ওরাই মনিব, মনিব যেন চোরের মত থাকতো।"

দাস-দাসীরা সুশীলাকে লুকাইয়া মৃণালের কাছে নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল। সত্যই সুশীলা তাহাদের নাকে দড়ি দিয়া খাটাইতেন, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাহাদের বিশ্রাম ছিল না। অনেকদিন এ রকমও গিয়াছে,—রাত্রিতে ঘুমাইয়াও তাহারা শান্তি পাইত না, সুশীলা ডাকিয়া হাঁকিয়া তাহাদের সজাগ করিয়া তুলিতেন।

মৃণাল ইহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া ব্যথা পাইল, বেচারা দাস-দাসীগণ চাক্‌রী করিতে আসিয়াছে, দাসত্ব করিলেও তাহাদের মনুষ্যত্ব তাহারা হারায় নাই,—তাহাদের উপর এ নির্য্যাতন কেন ?

সেদিন সকাল বেলাতেই সামান্য কি একটা কাজে ক্রটি ধরিয়া সুশীলা পদ্ম দাসীটাকে এমন তিরস্কার করিলেন,—যাহাতে সে বেচারী সকালবেলাই কাঁদিয়া একাকার কাণ্ড বাধাইল।

মৃণাল নিজের ঘরে থাকিয়া ব্যাপার সবই দেখিয়াছিল। পদ্ম আসিয়া তাহার কাছে কাঁদিয়া পড়িল; বলিল, "আমি আর এখানে থাকতে পারি নে দিদিমণি! অনেককাল আছি, তোমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, বাবুকে নিজের মত দেখি। নিজের বলতে জগতে আমার কেউ নেই,...তোমাদেরই নিজের বলে দেখি। আজ পিসী-মা এসে আমায় যা না তাই বলবেন—এ আমি সইতে পারবো না দিদিমণি...!"

মৃণাল তাহাকে সান্ত্বনা দিল ; বলিল, "আমি পিসী-মাকে বলবো এখন পদ্ম, তুমি মিছে কাঁদাকাটি করো না। পিসী-মা মানুষ বুঝতে পারেন না, শোকে তাপে মানুষটা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, তাই যাকে যা না বলবার উনি তাই বলেন। আমাকেই কি কম কথা বলে থাকেন,— বাবাও অনেক কথা শোনেন। সয়ে যাও পদ্ম—আমি পিসী-মাকে বুঝিয়ে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেইদিন আহারের সময় সে সুশীলাকে বলিল, "পিসী-মা! একটা কথা বলবো, ..রাগ করবে না তো ?"

আন্দাজেই কতকটা বুঝিয়া লইয়া সুশীলা বলিলেন, "কি কথা আগে শুনি, তারপর রাগ করবো কি না পরে ভেবে দেখবো।"

মৃণাল ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি পদ্মের কথা বল্‌ছিলুম—"

একমুহূর্ত্তে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সুশীলা বলিলেন, "তা আমি বুঝেছি, ঝি-মাগি তোমার কাছে গিয়ে বুঝি দশখানা করে লাগিয়েছে। ছোটলোকদের দস্তুরই ওই, হয় একখানা—করে দশখানা। ওদের হাজারই ভদ্রভাবে মানুষ কর—শিক্ষা দাও, জাতের স্বভাব যায় না। রক্তের দোষ যাবে কোথায়?"

মৃণাল বলিল, "পদ্মকে তুমি যা-তা বলতে পারো না পিসি-মা; পদ্মকে আমি মায়ের মত দেখি! সে যদি না থাকতো এতদিন আমায় কেউ দেখতে পেত না। আর সকল ঝি-চাকর হতে পদ্ম যে আলাদা, আমি তোমায় শুধু সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

মৃণালের দৃঢ় কথার উপর কথা বলিতে সুশীলার সাহস হইল না, তাই তখনকার মত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আনন্দবাবুর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, "আমায় পাঠিয়ে দাও দাদা,—আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই চলে যাই। খেতে পরতে পাই না পাই আর তোমার বাড়ী আসব না এ কথা আমি বলে যাচ্ছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া আনন্দবাবু বলিলেন, "আজ আবার কি হল?"

তিনি বেশই বুঝিয়াছিলেন, মৃণাল অন্যায় সহ্য করিতে পারে না, দাস-দাসীর উপর অত্যাচার সে সহিতে পারিবে না। পিসি-মার প্রাধান্য সে সব রকমে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবে, মানিবে না—দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবার বেলায়।

হইয়াছেও ঠিক তাই, মৃণাল সহ্য করিতে পারে নাই এবং এই লইয়াই সে সুশীলাকে বোধ হয় দু' এক কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

আনন্দবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি হল, যাতে তুমি চলে যেতে চাও?"

সুশীলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমায় ঝি-চাকরদের সামনে এত নীচু করা! কেন—আমার কি এ-বাড়ীর উপর কোন দাবী-দাওয়া নাই—আমি সম্পর্কে পাতিয়ে এসেছি? না বাপু—দরকার নেই, এখনও মানে মানে চলে যাওয়াই ভালো, এর পর দ্বারোয়ানে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে।"

আনন্দবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, "দ্বারোয়ান গলাধাক্কা দেবে—তোমায়? পাগলের মত যা তা বলো না সুশীলা!"

সুশীলা বলিলেন, "পাগল যে ওরা আমায় করে তুলেছে দাদা! তোমার মেয়ে আমায় ঝি-চাকরের সাম্‌নে অপমান করবে—"

বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন—

"হলুমই বা গাঁয়ের মুখ্যু মানুষ, তোমার মেয়ে না হয় এম্‌-এ পাশ,—তবু আমি ওর বাপের বোন—পিসী; আমায় অপমান করলে যে ওর বাপেরই অপমান করা হয় এটা ওর বিবেচনায় এলো না?"

আনন্দবাবু মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন; বললে সে বুঝবে, আর তোমার কাছে মাপও চাইবে, আমার এ বিশ্বাস খুব আছে। তুমি এখন যাও সুশীলা, আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিলেই তো হল।"

সুশীলা চলিতে চলিতে বলিলেন, "আর ব্যবস্থা ঠিক করে কোন দরকার নেই দাদা, ব্যবস্থা যা করবার তা আমিই করব এখন।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আনন্দবাবু শুনিতে পাইলেন সুশীলা পুত্রকন্যা লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আনন্দবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনুতপ্তকণ্ঠে মৃণাল বলিল, "আমারই দোষ বাবা, এরজন্য আমায় শাস্তি দাও। ঝি-চাকরদের উপর পিসী মা যে অন্যায় উপদ্রব করতেন আমি তা সইতে পারিনি; আমি তাঁকে কেবল বলেছিলুম মাত্র—কেবল—"

বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল।

আনন্দবাবু সান্ত্বনাপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "না মা, আমি তো তোকে সে জন্যে দোষ দিচ্ছি নে। সুশীলা নিজের ভুল বুঝতে পারবে,—আবার একদিন ফিরবেই।"

মৃণাল চোখ মুছিয়া সরিয়া গেল।

রাত্রে যখন আহার্য্য দেওয়া হইতেছিল, তখন দেখা গেল—নিশানাথ ঠিক নিজের আসনে খাইতে বসিয়াছে।

বিস্মিত মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, তুমি না গিয়েছিলে নিশানাথ?"

অরুণ দন্তপাতি বিকশিত করিয়া নিশানাথ বলিল, "ক্ষেপেছ দিদি, আমি কোথায় যাব? মা আর দিদিও বেশী দূর যায় নি, এই ও-পাড়াতেই চাটুর্য্যে বাড়ী রয়েছে। আমি চুপচাপ পালিয়েছি, ওরা আমায় আর খুঁজে পাচ্ছে না!"

বলিতে বলিতে সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

প্রচুর হাসিয়া একটা দম লইয়া সে বলিল, "দিব্যি আছি · খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি, এমন রাজার হালে রয়েছি, এ সব ফেলে আমি যাব কোথায়? একমুঠো ভাতের জন্যে হ্যাংলাপনা আর আমার ভাল লাগে না দিদি! দেখ না, মা দিদিকেও বেশীদিন কোথাও

থাকতে হবে না, দু-চারদিন যেতে না যেতে দেখবে, ওরা এসে জুটবে।"

রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া সে হাঁক দিল, "ঠাকুর, ভাত নিয়ে এসো! আমার সেই মাছের মুড়োটা দিও,...সেটার জন্যেই আমি কিন্তু এসেছি...মনে রেখো!"

মৃণাল হাসিল।

*   *
*

সরিতের জ্বর ;—

সেদিন জ্বর বেশ বেশী রকমই হইয়াছিল ; আগাগোড়া একটা র‍্যাগে ঢাকা দিয়া সরিত শুইয়া ছিল।

উমাদেবী এতক্ষণ নিকটে ছিলেন, এইমাত্র তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া কি কাজে গিয়াছেন, দাসী মেঝেতে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতেছিল।

সরিতের তন্দ্রা হঠাৎ ছুটিয়া গেল, দরজার দিকে চোখ পড়িতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—দরজায় দাঁড়াইয়া মৃণাল।

সরিতের জ্বর শুনিয়া সে দেখিতে আসিয়াছে। কোনদিন সে এ বাড়ীতে আসে নাই—আজই আসিয়াছে।

সরিত উঠিবার জন্য চেষ্টা করিল, মৃণাল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল ; বলিল, "উঠবেন না—আপনার বড় জ্বর, শুয়ে থাকুন !"

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে সরিত বলিল, "শোয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? মা কোথায়, বেলাই বা গেল কোথায় ? আপনি এলেন আর তারা—"

মৃণাল সরিতের মাথার কাছে চেয়ারখানা টানিয়া তাহাতে বসিল; বলিল, "থাক্—থাক্, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না; আমি নিজেই বস্‌ছি! বেলা তার খোকাকে শান্ত করছে, মা কি কাজ করছেন, এখনি আসবেন! আপনাকে অনর্থক ব্যস্ত হতে হবে না, আপনি শুয়ে থাকুন!"

মৃণাল আসিয়াছে,—

সরিত কোনদিন এ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

মা যেদিন মৃণালকে বধূরূপে গৃহে আনার কল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেদিন এ গৃহে কোথায় তাহাকে মানাইবে—এই কথা ভাবিয়া সরিতের হাসি পাইয়াছিল।

উৎসাকে এ গৃহের বধূরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। গ্রামের মেয়ে উৎসা—বাহিরের আবহাওয়ায় সে পুষ্ট হয় নাই, বাহিরের চিন্তাধারার সহিত সে পরিচিতা হয় নাই। সেই উৎসাকে এ গৃহে মানায়—কিন্তু মৃণালকে মানায় না।

সরিত নিস্তব্ধে চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল; সে ভাবিতেছিল উৎসার কথা—

বিলাতে সে অনেক মেয়ের সহিত পরিচয় হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, কোন মেয়েই তার অন্তরে প্রবেশের অধিকার পায় নাই। সে সকলের সহিত মিশিয়াছে, ধরা কাহাকেও দেয় নাই।

পাশ্চাত্যের মেয়েদের সে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই বরং ঘৃণা করিয়াছে। এ দেশে ফিরিয়া প্রথমেই যে মেয়েটি তাহার চোখে পড়িয়াছিল—সে উৎসা।

সোনার সংসার

সামান্য গ্রাম্য-মেয়ে সে—লেখাপড়া বেশী জানে না, তবু সরিত উৎসাকেই চাহিয়াছিল এবং আশাও করিয়াছিল—উৎসা তাহার গৃহ রমণীয় করিয়া তুলিবে।

যাহাকে চাহিয়াছিল তাহাকে সে পাইল না—সে আজ অন্যের পরিণীতা পত্নী ; আজ তাহার চিন্তা করাও নাকি মহাপাপ !…

হঠাৎ সরিত চমকিয়া উঠিয়া চাহিল, মৃণাল তাহার মাথায় হাত দিয়াছিল—সরিত চাহিতেই সে অপ্রস্তুত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

"আপনার খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে,—না ?"

মৃণালের প্রশ্নে সরিত উত্তর দিল, "প্রথমটায় খুব যন্ত্রণা ধরেছিল, এখন কমে গেছে।"

উমাদেবী খুব ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "মৃণাল এসেছে শুনলুম।…আমি এইমাত্র সবে গিয়েছি, তাড়াতাড়ি করে—"

মৃণাল উঠিয়া দাঁড়াইল ; হাসিমুখে বলিল, "তাতে কি হয়েছে বলুন তো ?…আমার তো কোন অসুবিধেই হয় নি, সরিতবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি। আপনি বসুন !"

উমাদেবী সরিতের বিছানার পাশে বসিলেন ; তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এখন বেশ ঘাম হচ্ছে, জ্বরটা ছেড়ে যাবে এখন। রোজই এমনি হয়, কেঁপে জ্বর আসে, আবার বিকেল হতে ঘাম হয়—রাত বারটার মধ্যে জ্বর ছেড়ে যায়। এই তো আজ পাঁচদিন হল, রোজ এই একই সমান চলছে।"

মৃণাল বলিল, "ম্যালেরিয়ার দস্তরই এমনি ; কুইনাইন এর একমাত্র ওষুধ ;—খাচ্ছেন তো ?"

সরিত বিকৃত হাসিল ; বলিল "সে আর বল্‌তে হবে না মৃণালদেবী! কুইনাইনে দেহ একেবারে জর্জ্জর হয়ে গেছে, তবু জ্বর যায় না।"

মৃণাল বলিল, "সাবধানে থাক্‌লে এ জ্বরটি হতো না, এমন করে ভুগতেও হতো না।"

উমাদেবী বলিলেন, "ও আবার সাবধানে থাকবে? এমন অত্যাচারী ছেলে যদি দুনিয়ায় একটি দেখতে পাওয়া যায়! এই যে এখানে এসেছে, দু' দিন হয় তো ভাল ছিল, তাতেই অত্যাচারের শেষ ছিল না।"

মৃণাল বলিল, "কি করে তিন-চার বছর বিলাতে ছিলেন বলুন তো? সেখানে তো মা আপনার সঙ্গে সঙ্গে যান নি! এই রকমই অত্যাচার চালিয়েছিলেন বোধ হয়?"

সরিত একটু হাসিবার চেষ্টা করিল ; বলিল, "অত্যাচার করলেও সেটা বিলাত—বাঙ্গলাদেশ নয়, কাজেই ম্যালেরিয়াও নেই।"

ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, দা...কে ডাকিয়া আলো জ্বালিবার আদেশ দিয়া উমাদেবী কি বলিবার জন্য মৃণালের দিকে তাকাইয়াও স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

মৃণাল বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আমি এবার বাড়ী যাই, বাবা আবার ভাববেন।"

উমাদেবী বলিলেন, "বাধা দেবো না ;—দিলে তিনি আবার কাল তোমায় হয় তো আসতে দেবেন না। মধুকে বলি, আলো নিয়ে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে ; পথে যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে কিনা!"

মৃণাল বলিল, "আলোর কোন দরকার নেই ; চাঁদিনী রাত,

পথ-ঘাট এতক্ষণ জোৎস্নার আলোয় ভ'রে গেছে। মধু বরং একটু এমনিই সঙ্গে চলুক।"

উমাদেবী শুনিলেন না, একটা লণ্ঠন দিয়া মধুকে মৃণালের সঙ্গে দিলেন।

শুক্লা-অষ্টমীর সন্ধ্যা, আকাশে চাঁদখানা অর্দ্ধাকৃতিতে জাগিয়া উঠিয়াছে—চারিদিক শুভ্র আলোয় পূর্ণ হইয়া গেছে। কোথায় কোন্ গাছে একটা পাপিয়া গান ধরিয়াছে—'চোখ গেল, চোখ গেল।'

পল্লী-পথ নিস্তব্ধ, তাহার উপর চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মনে হয়, কে যেন শুভ্র একখানা চাদর বিছাইয়া দিয়াছে।

দূরে কৃষকদের কুটিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, উনান জ্বলিতেছে, তাহারই আলোয় খানিকটা করিয়া জায়গা লাল দেখা যাইতেছে। পথের ধারে নবীন জেলের কুটিরের সামনে একটা দড়ির খাটিয়ায় শুইয়া কে এই জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর রজনীকে আরও রমণীয় আরও সুন্দর করিয়া তুলিতে বাঁশীতে সুর দিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁশীর সুর আকাশের দিকে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মৃণাল সেই জায়গাটিতে মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—

তাহার পর আবার চলিতে চলিতে মৃণাল বলিল, "এবার তুমি যেতে পার মধু! বাড়ী দেখা যাচ্ছে, আমি যেতে পারবো এখন।"

মধু বলিল, "না, গিন্নি-মা আপনাকে একেবারে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছেন, এখান হতে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে গেলে, গিন্নি-মা, দাদাবাবু কেউ আমায় আর আস্ত রাখবেন না।"

মৃণাল একটু হাসিল।

চলিতে চলিতে আবার জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বুঝি তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে থাকতে মধু?"

মধু উত্তর দিল, "অনেক দিনের পুরানো কি না দাদাবাবু আমাকেই নিয়ে গেছলেন।"

"ও: ..."বলিয়া মৃণাল নীরব হইল।

পথেই দেখা হইল দ্বারোয়ান ও নিশানাথের সঙ্গে। মৃণালকে দেখিয়াই নিশানাথ চীৎকার করিয়া উঠিল এই যে দিদি।...আর আমাদের যেতে হবে না দ্বারোয়ানজি!

মৃণাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, তোমরা বুঝি আমায় খুঁজতে বার হয়েছ?"

নিশানাথ বলিল, "না বার হয়ে আর উপায়ই বা কি বল দেখি? সেই যে বিকেল বেলা বার হয়েছ, তার পর আর দেখাটি নেই। কেউ জানে না কোথায় গেছ; ভাবনা হয় না নাকি? আর তোমা[illegible] কল্‌কাতার লোক, শেষকালে এই গাঁয়ে—"

বাধা দিয়া মৃণাল বলিল, "যদি হারিয়ে যাই,—কেমন? কল্‌কাতার লোক পাড়াগাঁয়ে হারিয়ে যায় কখনো শুনেছ?"

মৃণাল হাসিতে লাগিল।

মধুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি এবার যাও মধু, আর তোমার আসার দরকার হবে না।"

মধু ফিরিয়া গেল।

*　　*
*

অজয়ের ভালবাসার নেশা দু'-দিনেই মিটিয়া গিয়াছিল, সে যেমন বাহিরের লোক ছিল, তেমনই হইল।

উৎসা শ্বাশুড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু শ্বাশুড়ীও তাহার উপর সদয় নহে; অকস্মাৎ তিনিও অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছেন।

অপরাধ তাঁহারও নয়; অজয় তাঁহার অনুমতি না লইয়া বিবাহ করিয়াছে, ইহাতে তিনি প্রথমটায় একটু ক্ষুন্ন হইলেও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সে বেদনা ভুলিয়াছিলেন।

অজয় সংসারী হইবে—ঘরের দিকে তাহার মন ফিরিবে, এই ছিল তাঁহার একমাত্র আশা এবং এইজন্যই অজয় তাহার অজস্র ভালবাসার বাণে বেচারা উৎসাকে যখন ভাসাইয়া দিতেছিল, তখন অনেকে অনেক কথা উপহাস করিলেও তিনি সে সব কথা কাণে লইতেন না। ভাবিয়াছিলেন—গৃহত্যাগী পুত্রের গৃহের প্রতি যে আকর্ষণ আসিয়াছে, এইটি যদি স্থায়ী হয়, লোকে কেন তাহাতে উপহাস করিবে?

সেই অজয় আবার যখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরের স্রোতে ভাসিয়া পড়িল, তখন যত দোষ পড়িল উৎসার উপর;—'কেন সে অজয়কে গৃহাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না?'

অভাগিনী উৎসা আশ্রয় পাইয়াও হারাইল।

উৎসা ভাবিয়া পায় না, দোষ কাহার—তাহার কি অজয়ের?

অজয় কেন তাহাকে অতখানি উপরে তুলিল—আবার এমনভাবে মাটিতে ফেলিয়া দুই পা দিয়া দলিয়াই বা গেল কেন? উৎসা তো এ ব্যবহার চায় না; সে চাহিয়াছিল—সমানভাবে থাকিতে—যেমন সকল স্ত্রী থাকে।

অভিমান করিবে,...কিন্তু কাহার উপরে—?

উৎসা নিজেকে ধিক্কার দেয়;—

সত্যই সে দাসীরও অধম। এখানে আর কেহ না জানুক, উৎসা তো জানে,...সে শুনিয়াছে অজয় তাহার মাতুলকে তাহার বিনিময়ে অর্থ দিয়াছে। স্ত্রী যেমন স্বগর্ব্বে মাথা তুলিয়া স্বামীর আলয়ে আসে—নিজের অধিকার স্থাপন করে, সে গৌরব তার কই?

সে ক্রীতদাসী,—

হাঁ, সে ক্রীতদাসী বই আর কি?..তাই না অজয় তাহাকে যখন খুসি উপরে তুলিয়াছিল, ইচ্ছামত আবার মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে।

গরীবের ঘরে গরীবের মেয়ের যাওয়াই উচিত ছিল। কে চাহিয়াছিল রাজধানীর বুকে এই সুরম্য প্রাসাদের রাণী হইতে? উৎসা জানিত তাহার বিবাহ হইবে কোনও গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলের সঙ্গে। হোক্ না সে কুঁড়ে ঘর, উৎসা সেখানেই পরম সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত, নিজের হাতে সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিত। কে চাহিয়াছিল এই জড়োয়া গহনার বোঝা বইতে, কে চাহিয়াছিল এমন নিষ্ক্রীয় জীবনযাপন করিতে?

উৎসার কোন কাজ নাই—সে হাঁফাইয়া উঠে।

উৎসা শাশুড়ীর ঘরের দরজায় উঁকি-ঝুঁকি মারে—তিনি কদাচিৎ চোখ তুলিয়া চান,···সে দৃষ্টিতে যেন ঘৃণা ও অবহেলার ভাবই ফুটিয়া উঠে।

উৎসা আস্তে আস্তে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসে। কাঁদিতেও সে আর পারে না—চোখের জল তাহার ফুরাইয়া গেছে।

এই সময়ে সতীর একখানা পত্র আসিল···বহুকাল পরে সতী তাহার খোঁজ করিয়াছে। বিবাহের পর এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত উৎসা সতীর কোন সংবাদ পায় নাই।

সতী লিখিয়াছে—তাহার নিজের অবস্থার কথা,···তিনটি সন্তানই তাহার একে একে কোল হইতে খসিয়া পড়িয়াছে,—আজ তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে কেহ নাই। কি করিয়া কেমনভাবে যে তিনজন চলিয়া গেছে তাহা সতী পত্রে লিখিতে পারে না, তাহার হাত অবশ হইয়া আসে—হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। সতী আজ একা—একেবারেই একা! আজ কাহারও খাওয়ার ভাবনা তাহাকে করিতে হয় না, কাহাকেও ঘুম পাড়াইবার জন্য ভাবিতে হয় না; কে কাঁদিতেছে বলিয়া তাহাকে উৎকর্ণ হইতে হয় না। সতী ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার স্বামীর আলয়ে; স্বপত্নী-পুত্রেরা দয়া করিয়া একখানা ঘর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই ঘরে সতী থাকে। নিজের আহারের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না—একদিন দু'দিন অনাহারেও সে দিন কাটাইয়া দেয়।

উৎসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে;—

সংসারে দুঃখ কাহার কম,—কে বলিতে পারে সে দুঃখ পায় নাই ? উৎসার কি গিয়াছে—সতী যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে।

তিন মাস পরে অজয় বাড়ী ফিরিল।

মা বলিলেন, "আমি কাশী যাচ্ছি অজয়, তোমার বাড়ী-ঘর সব রইলো।"

অজয় মাথা চুলকাইয়া বলিল, "কিন্তু···তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না মা···"

মা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছিল বরাবরই ; মাঝে দু'চার মাসের জন্যে সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম, আবার সংসার করবার ইচ্ছা হয়েছিল ; আজ দেখ্‌ছি, মহা ভুলই করেছি, সেই সময় বার হয়ে পড়লেই হতো ; কিন্তু আর নয়, এবার আমাকে যেতেই হবে। তোমার বাড়ী, ঘর-সংসার তোমায় বুঝিয়ে দিয়ে ছুটি হয়ে যেতে চাই, তার পর তুমি থাক বা যেখানে খুশী যাও, আমার দেখা বা জানবার কোন দরকার হবে না।"

অজয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর কেবল মাত্র বলিল, "বেশ—"

কথাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই শুনাইল।

তিনমাস পূর্ব্বে সে শরীর অসুস্থের ওজর করিয়া ওয়াল্‌টেয়ার চলিয়া গিয়াছিল, ইহার মধ্যে দু' তিনখানা পত্র দু' তিন লাইন কথা দিয়া লিখিয়াছিল, "সে ভাল আছে," এইটুকু কথা মাত্র !

তিন মাসের মধ্যে গৃহের কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, তথাপি সে গৃহে ফিরিতে পারে নাই।

সহসা সেখানকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে; জানে, সে ক্ষমা পাইবে না,—সে জন্য ক্ষমার প্রার্থনাও সে করিতে পারিল না।

একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তো কাশী যাবে মা,··· তোমার বউ—"

বাধা দিয়া শুষ্ককণ্ঠে মা বলিলেন, "আমার নয়—তোমার স্ত্রী; আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই—তোমার সঙ্গে আছে।"

আঘাত পাইয়া অজয় বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া গেল; একটু পরে আবার বলিল, "কিন্তু ওকে আমি তোমারই ভরসায় এখানে ফেলে রাখি..."

কঠিনমুখে মা বলিলেন, "ভুল করেছো।"

অজয় বলিল, "তুমি ওর একটা ব্যবস্থা করে যেয়ো মা!"

মা কেবলমাত্র বলিলেন, "পাগ্‌লামী করো না অজয়!"

তিনি নিজের গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

*　*
*

উৎসা বিনয়কে পত্র লিখিতেছিল, অজয় তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। উৎসা একবার মুখ তুলিয়া দেখিল মাত্র, তাহার পর যেমন লিখিতেছিল তেমনই লিখিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে উৎসা!"

দু-দিন সে আসিয়াছে, এই প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল; অজয় দুই দিন বাহিরেই রহিয়াছে।

কলম নামাইয়া উৎসা জিজ্ঞাসুনেত্রে অজয়ের পানে তাকাইল।

অজয় একেবারে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল; বলিল, "আমি বল্‌ছি কি,—মা তো কাশী চলে যাচ্ছেন আর ফিরে আসবেন না বলছেন—"

উৎসা ধীরকণ্ঠে বলিল, "তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বিদায় হতে হবে—এই কথাই বলতে চাও তো?"

অজয় হতভম্ব হইয়া রহিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না,...তবে তুমি থাকৃতে পারবে কিনা আমি তাই ভাবছি।"

উৎসা কলম তুলিয়া লইয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিল; বলিল, "সে ভাবনা করবার দরকার নেই; আমার ভাবনা যখন আমাকেই ভাবতে দিয়েছ তখন আমি ভেবে ঠিক করে নেব।"

অজয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উৎসার পত্র লিখা শেষ হইল—সে মুখ তুলিল, অজয় তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শান্তকণ্ঠে উৎসা বলিল, "এতক্ষণ সময় এখানে দাঁড়িয়ে আছ?... বাইরে তোমার অনেক কাজ পড়ে থাকতে এখানে এতক্ষণ সময় নষ্ট করা অন্যায় হচ্ছে।"

অজয় রাগ করিবে ভাবিল, কিন্তু রাগের স্বরে কথা ফুটিল না, ক্লিষ্টস্বরে সে বলিল, কাটা ঘায়ে আর নুন দেবে না বলে আশা করছি উৎসা—!"

উৎসা শান্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার কাটা ঘায়ে নুন দিতে পারে ক্রীতদাসীর সে স্পর্দ্ধা নেই—ক্ষমতাও নেই।"

"ক্রীতদাসী...?—তুমি কি আমার কেনা দাসী মাত্র উৎসা! নিজেকে এত হেয়...এত ছোট বলে প্রকাশ করতে পারছো তুমি?"

অজয়ের কণ্ঠ হইতে স্বর ফুটিতে চায় না।

উৎসা বলিল, "কিন্তু এ যে সত্যি কথা, এর মধ্যে মিথ্যে তো কিছু নেই।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি সত্যি কথা?"

উৎসা বলিল, "সত্যি কথা যে, তুমি আমার মামাকে কিছু টাকা দিয়ে আমায় নিয়ে এসেছো। আমার অর্থলোভী মামা, কিছু টাকার

বিনিময়ে তোমায় চরিত্রভ্রষ্ট মাতাল জেনেও আমায় তোমার হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা করেন নি; কিন্তু আমার বাবা কি মা যদি বেঁচে থাক্‌তেন, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে আমায় এমন অপদার্থ ধনীর ঘরে পাঠাতেন না,...আমার জীবন বিষময় করে দিতে পারতেন না..."

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "এর চেয়ে আমায় যদি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে ঘর নিকিয়ে বাসন মেজে খেতে হতো, সেও ছিল আমার গৌরব। স্ত্রীর মর্য্যাদা তুমি কোনদিন আমায় দিয়েছো, স্ত্রীর অধিকার এ সংসারে আমি পেয়েছি কি? এ সংসারে বেতনভোগী দাসীর যে স্বাধীনতা আছে আমার তা'ও নেই; সে ইচ্ছা করলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে, ক্রীতদাসীকে আ-মরণকাল এমনই ভাবে থাক্‌তে হবে,—তার এক পা সর্‌বার নড়বার অধিকার নেই, তাকে যে দিন খুশী মাথায় তুলবে যে দিন খুশী পায়ে দল্‌বে; মুখ তার থাকবে চিররুদ্ধ—চোখ তার থাক্‌বে নির্জল—শুক্‌নো।"

উৎসার মুখে এ সব কি কথা। দেড় বৎসর প্রায় বিবাহ হইয়াছে, অজয় কোনদিন তাহার মুখে একটি কথা শুনে নাই। তাহার অজস্র সোহাগে আদরে সে যেমন ছিল নির্ব্বিকার, অবহেলায় তাচ্ছিল্যে তেমনই রহিয়াছে নির্ব্বিকার। উৎসা যে এত কথা বলিতে পারে তাহা তো অজয় জানে না।

অজয় হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি কি বল্‌ছো উৎসা, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।"

মুখ ফিরাইয়া অতি গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া শুষ্ককণ্ঠে উৎসা বলিল, "বুঝতে পারছো বই কি,...বলবে না—স্বীকার করবে না, তুমি সব বুঝেছ। শোন—একটা কথা তোমায় বলি,...আমায় এ রকম অবস্থায় না রেখে আমায় মেরে ফেল—খুন কর; না পার, আমায় বিষ দাও,—আমি মরি! বেঁচে থেকে এ গ্লানি সইবার মত ক্ষমতা আমার নেই, আমি পারবো না—আর আমি পারবো না!"

অজয় তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি ভুল বুঝছো উৎসা—ভুল বুঝছো! আমি তো তোমায় কিনে আনিনি, তোমার মামা তোমায় আমার কাছে বিক্রি করেন নি; এ ভুল কথা তোমায় কে শুনালে, আগে আমায় সেই কথাটা বল। আশ্চর্য্য!...আজ দেড় বৎসর ধরে এই ভুল ধারণাটা তোমার মনে জাগিয়ে রেখেছ,...তাই আমি তোমার নাগাল পাইনি! আমি তোমায় আদর করেছি, তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। কোনদিন তোমার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পাইনি, কোনদিন তোমার মধ্যে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে পারি নি। কই, এত দিন তো কোন কথা বল নি উৎসা! কোন কথাই তো আমায় জানতে দাও নি; জানালে, আমি তোমার এ ভুল দূর করতে অন্ততঃপক্ষে চেষ্টাও করতুম।"

উৎসা মাথা নাড়িল, "এ ভুল নয়—সত্যি, তুমি কি আমার বিনিময়ে মামাকে টাকা দাও নি—?"

অজয় বলিল, "টাকা আমি দিয়েছি, কিন্তু তোমার বিনিময়ে নয় উৎসা! তোমায় আমি এত ছোট বলে ধারণা করতে পারি নি,—যা অর্থের বিনিময়ে লোকে পেতে পারে। তোমার মামা,—শুনে রাগ ক'রো

না—দুঃখ পেয়ো না,—তোমার মামা আমার কাছে থেকে ভিক্ষা ক'রে টাকা নিয়েছেন।"

উৎসা বলিল, "তিনি ভিক্ষা চাইলেন আর তুমি ভিক্ষা দিলে?"

তাহার স্বরে কোমলতা ছিল না।

অজয় বলিল, "হ্যাঁ দিলুম; তুমি জানো না উৎসা, আমার প্রকৃতিই এই রকম, কেউ কিছু চেয়ে আমার কাছে ব্যর্থ হয় নি। নিজের গুণ আমি বর্ণনা করছিনে, যা সত্য আমি তাই বলছি। হ্যাঁ, আমি অসচ্চরিত্র—আমি মাতাল;...কিন্তু সেছিলুম উৎসা! তোমায় দেখে সেই প্রথম সৎ হওয়ার কামনা করেছিলুম, দেড় বছর আমায় কেউ দোষ দিতে পারবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি। জানো উৎসা, মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে, সে যখন সত্যকার সাধুর জীবন যাপন করতে চায়। কোন মানুষ বলতে পারবে না—সে ভুল করে নি, কিন্তু ভুলের পথ বেয়ে কেউ আ-মরণ চলছে এ কথা শুনেছো কি?

উৎসা চুপ করিয়া রহিল।

অজয় বলিল, "আমি দেখলুম, প্রতিমায় আমি প্রাণ সঞ্চার করতে পারি নি,....আমার আদর সোহাগেও তুমি নির্ব্বিকার রয়ে গেলে উৎসা! তাই তোমার' পরে রাগ করে আমি আবার আমার আগের জীবনকে বরণ করে নিতে গেলুম,—কিন্তু পারলুম না উৎসা, আমার ফেলে-আসা জীবনকে আর আমি পেলুম না,—সে পথও আমার হারিয়ে গেছে। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে আবার মদ খেতে গেলুম—হাত কেঁপে গ্লাস পড়ে গেছে; বাইজির নাচ-গানের মধ্যে নিজের বর্ত্তমান সত্ত্বা ডুবিয়ে দিতে চাইলুম—তার চোখে তোমার দৃষ্টি দেখতে পেলুম, তার

গানে তোমার স্বর শুনতে পেলুম। আমি তিন মাস পরে আবার যে ঘরে ফিরেছি...দেখছি সে ঘর আমার ভেঙ্গে গেছে,—আমার মা আমায় ত্যাগ করেছেন, আমার স্ত্রীও আমায় ত্যাগ করেছে।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি আজ আবার ফিরে যাব উৎসা...নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আমি চলে যাব আবার সেইখানে। মাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলুম, তোমার ভার তোমার পরেই দিলুম। একটা কথা শুধু ভুলো যেয়ো তুমি,—তুমি ক্রীতদাসী নও, তুমি এ সংসারের লক্ষ্মীরূপিনী বধূ; তোমার স্থান এ সংসারে অব্যাহত—তোমার অধিকার সর্ব্বত্র সব সময় সমান।"

উৎসা মাথা নত করিয়া ভাবিতেছিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

দুই পা পিছাইয়া অজয় বলিল, "আমি যাচ্ছি—আমার যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আর কোনদিন যদি না ফিরি, তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যদি না দেখা হয়, তবুও মনে করো উৎসা—আমি তোমায় পেয়ে সৎ-জীবন যাপন করবার কামনাই করেছিলুম।"

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া সে উৎসার সম্মুখে রাখিল; বলিল, "কাল আমার উইল করে ফেলেছি। আমি যতদিন যেখানে থাকব, আমায় প্রতি মাসে এক-শো টাকা করে নিতে হবে, মাও যেখানে যখন থাকবেন তাঁকেও এই এক-শো টাকা করে পাঠাতে হবে, আর আমার যা কিছু রইলো সমস্তই তোমার, তুমি যা খুসি করতে পার...আমরা কেউ তাতে বাধা দেব না।"

উৎসা নিশ্চল·· যেন পাষাণ-প্রতিমা ; হাতে করিয়া উইল তুলিয়া লইল মাত্র।

তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অজয় সে গৃহে ছিল না।

উইল ফেলিয়া দিয়া উন্মাদিনীর মত উৎসা ছুটিল,...সম্মুখেই দাসী,—

উৎসা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর দাদাবাবু কোথায় বিণু ?···তিনি—"

দাসী উত্তর দিল, "এই তো দাদাবাবু গিন্নী-মাকে নিয়ে গাড়ীতে করে চলে গেলেন, সরকার জিনিষপত্র নিয়ে আগেই চলে গেছে। ওরা এই ট্রেণে কাশী যাচ্ছেন।"

উৎসা বজ্রাহতার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল।

তাহার পর যখন সে নিজের গৃহে ফিরিল, তখন মন তাহার জ্ঞান ছিল না ; তাহার পা কোথা হইতে কোথায় পড়িতেছিল ঠিক নাই।

দরজাটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া সে কঠিন মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল—"ওগো, আমায় মার্জ্জনা চাইবারও অবকাশ দিলে না. . নিষ্ঠুরভাবে কতকগুলো কথাই আমায় শুনিয়ে দিয়ে চলে গেলে !"

তাহার চোখের জলে ঘরের মেঝে ভিজিয়া উঠিল।

*   *

*

অজয় উৎসাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া চিরকালের মত চলিয়া গেছে শুনিয়া মহেশ দত্তের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো শুনছো, এখন আমাদের উৎসারই সব, —বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি ; উৎসা এখন রাণী বললেও ভুল হয় না।''

স্ত্রী বলিলেন, "তবে আমরা আর বাড়ী ভাড়া করে থাকি কেন গো? সে বাড়ী তো ইন্দ্রির-ভুবন; আমরা কোন না দু'চারখানা ঘর নিয়ে সেখানে থাকতে পারি? তুমি যাও, উৎসাকে একবার বলে এসো গিয়ে, আমরা এই শ্রাবণের মধ্যেই ওখানে গিয়ে উঠি। এর পর ভাদ্দর মাস পড়বে—অযাত্রা মাস, লোকে শেয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত বাড়ী হতে তাড়ায় না। আশ্বিন মাসের পিত্যেশে আর এ বাড়ীতে থাকা চলবে না বাপু! এই তো দু' খানা ঘর—যেন পায়রার খোপ, না আছে জানালা—না আছে কিছু, ভিজে যেন স্যাৎস্যাৎ করছে। আজ এ বাড়ী ছাড়তে পেলে আমি আর কাল করবো না।"

মেয়ে দুইটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পরিবার এমন কিছু বেশী নাই। অন্ন-বস্ত্রের অভাবই যা বেশী পীড়ন করিতেছে, আর কিছু নয়।

মহেশ দত্ত দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, স্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন, "একটু খোসামোদ ক'রো,—বলো, নীচেয় আমি থাকব না, দোতালায় খুব ভাল দু'খানা ঘর আমার চাই। অবিশ্যি আমরা না বললেও তার তাই করা উচিত ; কারণ ওর এ অবস্থা তো আমাদেরই জন্যে হয়েছে, নচেৎ কোথায় ভেসে যেতো কে জানে।"

মহেশ দত্ত আরও দু' একবার উৎসার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, উৎসা দেখা করে নাই। যে মামা ভাগিনীর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে, তাহার উপর তাহার ঘৃণা বিরক্তির অবধি ছিল না।

আজ তাহার সে ঘৃণা নাই, কারণ সে স্বামীর নি[illegible] শুনিয়াছে মামা তাহার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন নাই, ভিক্ষা গ্র[illegible] করিয়াছেন। ভিক্ষা প্রবৃত্তির সমালোচনা করিবার অধিকার উৎসার নাই, তাই সে মামাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি দিল।

উৎসাকে দেখিয়া মামা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ; সে যেন উৎসা নয়, উৎসার ছায়া ; এমন জীর্ণ-শীর্ণ যে দেখিয়া চেনা যায় না।

মামা ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন, "আহা, বড় রোগা দেখাচ্ছে যে মা, অসুখ হয়েছিল বুঝি ?...তা একদিনও তো খবর দিস্ নি। তোর মামী এদিকে ছট্‌ফট্ করে মরে ; প্রায়ই বলে, 'যাও—মেয়েটাকে দেখে এসো',...তা' এলেও তো চোখে দেখবার যো নেই মা..!"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

উৎসা বলিল, "না, অসুখ-বিসুখ কিছুই হয়নি, বেশ ভাল আছি মামা! বাড়ার সব ভাল আছে তো,—মামী-মা, ছেলেরা..."

মহেশ দত্ত বলিলেন, "ওদের আর কোনকালে কি-ই বা হয়? গরীব মানুষরা একদিকে ভাল মা, বড়লোকদের মত নিত্যি অসুখ-বিসুখ হয় না, হলেই বা দেখবে-শুনবে কে,—করবে কে? হ্যাঁ,.... এখানে এ-সব ব্যাপার কি শুনছি বল তো মা!"

তিনি বেশ ভাল হইয়া বসিলেন।

উৎসা বলিল, "এখানকার কি ব্যাপার?"

মহেশ দত্ত বলিলেন, "ঐ যে শুনছি—জামাই না কি তোকে সব উইল করে দিয়ে তার মাকে নিয়ে কাশী না বৃন্দাবন কোথায় চলে গেছে, আর নাকি কখনও ফিরে আসবে না?"

উৎসা কি যেন ভাবিতেছিল, কোন উত্তর দিল না।

মহেশ দত্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "একি রাগারাগি করে যাওয়া, না এম্‌নিই যাওয়া? লোকে তো অনেকে অনেক কথা বলে; আমি বলি, তাই কি হতে পারে! এ কথা নির্ঘাত মিছে কথা....।"

উৎসা ধীরকণ্ঠে বলিল, "না—মিছে কথা নয়, এ সবই সত্যি কথা; তিনি আমায় সব দিয়ে চলে গেছেন আর ফিরবেন না বলেছেন।"

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। মহেশ দত্ত সে আর্দ্রতা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, চিন্তিতমুখে বলিলেন, "তবেই তো মুস্কিল। এই এত বড় বাড়ী ..নিজের কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া না থাকলে কেবল ঝি চাকরের 'পরে নির্ভর করে থাকা চলে না;...একটা অসুখ

আছে, বিসুখ আছে, নিজের কেউ না থাকলে দেখবে কে? তোর মামী-মা তাই বল্‌ছিলেন…”

উৎসা কেবল তাকাইয়া রহিল। সে কোন কথা না বলিলেও মহেশ দত্তের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল না; বলিলেন, “বলছিলেন…আমরা সবাই এসে এখানে থাকি। আমি বাইরের কাজ-কর্ম্ম দেখি, আর তিনি তোর কাছে থাকবেন, দেখা-শুনা করবেন—”

উৎসা মাথা নাড়িল; শুষ্ককণ্ঠে বলিল, “কিছু করবার দরকার নেই মামাবাবু! বিনয়-দা আজ এসেছেন, তিনি বাইরের সব ঠিক করেছেন আর বাড়ীর মধ্যে—”

ঠিক এই সময় যে বিধবা মেয়েটি আসিয়া উৎসার পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাহার পানে তাকাইয়া মহেশ দত্তের মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

উৎসা বলিল, “বাড়ীর মধ্যে আমার কাছে সর্ব্বদা থাকবার জন্যে বিনয়-দাকে পাঠিয়ে সতী-দিকে এনেছি। বেচারা কোথাও জায়গা পায় নি মামাবাবু! আপনার ওখানে অ-চিকিৎসায় তিনটি সন্তান হারিয়ে সতী-দি সতীনের ছেলেদের কাছে গিয়েছিল, সেখানে তারা পেটের একবেলা একমুঠো ভাত দিতে পারলে না, আমি তাই ওকে আমার কাছে এনেছি। এই দু' জন আমার ঘরে বাইরে থাকলেই চলবে মামাবাবু, আপনাদের আর এসে দরকার নেই। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে খোঁজ-খবরটা নেবেন, সেইটুকুই আমি ঢের পেয়েছি মনে করবো।”

পাংশুমুখে মহেশ দত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, “তাই হবে, আমি চল্‌লুম।”

তিনি চলিয়া গেলেন।

বিনয়কে ডাকাইয়া উৎসা বলিল, "মামা খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছিলেন বিনয় দা!"

বিনয় বলিল, "আরও অনেকে আছে, যারা এই সুযোগটা নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে উৎসা! আমার একটা কথা রাখ্ ভাই,....তুই নিজে একবার কাশী চল। আজ কুড়ি-একুশ দিন তাঁরা গেছেন, পত্র দেন নি; কিন্তু আমি একজনকে দেখতে পাঠিয়েছিলুম—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে উৎসা বলিল, "তা' তো আমায় বলনি বিনয়-দা—"

বিনয় বলিল, "না, তখন বলবার দরকার হয় নি, কিন্তু এখন বলবার দরকার হয়েছে। শুনলুম, গিয়েই অজয়ের খুব জ্বর হয়েছিল, এখন একটু ভাল হয়েছে, পথ্য করে সে বোম্বে চলে যাবে। তোর একবার সেখানে যাওয়া উচিত মনে করি উৎসা!"

উৎসা মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "আমি জানি, অজয় তোর একটি কথায় ফিরে আসবে, তোর কথায় রাগ করে সে চলে গেছে। অজয়কে ফিরাতে পারলে তার মাও ফিরবেন। তুই একবার চল উৎসা, এতে কোন লজ্জা নেই, অপমান নেই। আমি তোকে নিয়ে যাব, অজয়কে আমিও বুঝাবো।"

উৎসা সজল নেত্র তুলিয়া বিনয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "যে এক কথায় সব ফেলে চলে যেতে' পারে, সে কি ফিরবে দাদা....?"

বিনয় বলিল, "ফিরবে দিদি! বড় ভাইয়ের কথাটা শোন—আমি বলছি সে ফিরবে। তাকে ফিরিয়ে এনে তোকে তোর নিজের জায়গায় বসিয়ে আমি সরিতকে নিমন্ত্রণ করবো, সে মৃণালকে নিয়ে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে।"

উৎসা বলিল, 'ওঁদের বিয়ে হয়ে গেছে?"

বিনয় বলিল, "এই সাম্‌নেই উনত্রিশে শ্রাবণে বিয়ে হবে। সে কথা যাক্, তুই যাবি বল্?"

উৎসা বলিল, "যাব।"

*   *

*

আকাশে শ্রাবণের কালো মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে, সজল বাতাস স্ফুট-কদম্বের গন্ধ বহিয়া ছুটাছুটি করিতে সুরু করিয়াছে।

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উৎসা চাহিয়াছিল কালো মেঘভরা দূর আকাশের পানে—যেখানে আকাশের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ রেখার মত জাগিয়া উঠিয়া ধরণীর বুকে স্নেহের পরশ দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল।

ঝর্-ঝর্ করিয়া বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল—সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃষ্টির রূপ দেখা গেল না, কানে শোনা গেল কেবল তাহার ঝর্-ঝর্ শব্দটা মাত্র।

উৎসা চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল—দূর প্রবাসের কথা।

সেখানেও কি আকাশ এমনই কালো মেঘে ছাইয়া আসিয়াছে, এমনই বাদল বাতাস বহিতেছে,···সেখানে কি কদম্ব ফুটে—বাতাসে গন্ধ বিলায়?

অজয়ের অসুখ···

হয় তো খুব বেশী অসুখ,··যাহার জন্য বিনয় তাহাকে যাইতে বলিতেছে। বিনয় লোক পাঠাইয়া খবর আনাইয়াছে;—তাঁরা তো একটি খবরও দেন নাই···!

নিদারুণ অভিমানে উৎসার বুক ভরিয়া উঠে।

নিজের সমস্ত তাহাকে দিয়া—দীন-দুঃখীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সে চলিয়া গেছে দীন-দুঃখীর মত,…কিন্তু কেন? কে উৎসা—কি তাঁহার অধিকার আছে এই সম্পত্তির উপর? দীন-দঃখীর কন্যা, দারিদ্র্যের দুঃখ-কষ্ট সে বুঝে ;—তাহাকে প্রাচুর্য্য দিয়া পূর্ণ করা হইল কেন”?

চোখ দিয়া অজ্ঞাতে দুই ফোঁটা জল গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

না, এ সব তাহার অসহ্য—সে মুক্তি চায়; মুক্ত বিহঙ্গিনী খাঁচায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না, সে চায় স্বাধীনতা,—সেই তার প্রাণের বিকাশ।

—“ওগো বউ-দিদিমণি, একবার এদিকে এসো, মাছগুলো একবার দেখে যাও!”

প্রায়ই এই সব মেয়েরা ঝুড়ি বোঝাই করিয়া বিভিন্ন জাতির মাছ লইয়া আসে, উৎসা পছন্দমত মাছ কিনিয়া লয়।

মনে হইল, আজ হাটবার ছিল এবং যশোদা যখন হাটে যায় তখন উৎসা তাহাকে মাছের কথা বলিয়াছিল, সেই মাছের কথা তাহার মনে ছিল তাই সে মাছ লইয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিয়াছে, সতী ঠাকুর-ঘরে প্রদীপ দিয়া ঘরের সন্মুখ দিয়া যাইতে ভিতরে দেখিল উৎসা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

—“এই ঘরে কি করছো উৎসা?…ও বেচারা বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হুকুম মত এক ঝুড়ি মাছ এনে ফেলে গেছে,—দেখবে না?”

উৎসা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “ও আর দেখে কি করবো?…এনেছে—থাক, ঝিয়েরাই যা-হয় করবে এখন!”

দেওয়ালে ল্যাম্পটা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল, সতী ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো বাড়াইয়া দিল।

উৎসার আর্দ্র-কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছিল; তাহার নিকট সরিয়া আসিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল, "এই বৃষ্টির মধ্যে জানালা খুলে দিয়ে এখানে দাঁড়ানোর মানেটা কি? যে রকম জলের ঝাপটা আসছে, গা-মাথা যে সব ভিজে গেছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। দেখি মাথা…"

কাপড়ে, মাথায় হাত দিয়া সতী বলিল, "যা বলেছি তাই,… এই তো সব ভিজে গেছে! এসো—মাথা মুছে কাপড় জামা বদলে ফেল বলছি! একে তো পাড়া-গাঁ—ম্যালেরিয়ার দেশ, একটিবার জ্বর হলে আর বাঁচতে হবে না।"

উৎসা তাহার হাতখানা সরাইয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না—না, একটু ভিজলে আর জ্বর হচ্ছে না! এই ঠাণ্ডাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে….গা মাথা বড় জ্বালা করছিল কি না!"

সতী রাগ করিয়া বলিল, "সে আমি জানি! ভাল লাগা তো হয়েছে?…এবার আমি যা বলি, তা করলে সত্যি আমারও ভাল লাগবে। আমি যা বল্‌ছি, লক্ষ্মীমেয়ের মত তা শোন দেখি!"

তাহার জিদে উৎসাকে কাপড় জামা ছাড়িতে হইল, মাথাও মুছিতে হইল।

বিনয় আসিয়া বলিল, "তোমার মামী-মা আমায় ডেকেছিলেন উৎসা…"

উৎসা নীরবে তাহার পানে তাকাইল।

বিনয় বলিল, তিনি জানতে চান—আমি কে—কোন অধিকারে

আমি তোমার এখানে অভিভাবকস্বরূপ থাকি। তিনি জানালেন—তোমাকে এ-ঘরে দিয়েছেন তাঁরাই,—তোমার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের মূল তাঁরাই, এখনও তাঁরাই তোমার অভিভাবকস্বরূপ এখানে থাক্‌তে চান।"

"আমার সৌভাগ্য…!"

উৎসার চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল—মুখখানা বিকৃত হইয়া গেল; পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য…? এঁদের এই নিঃস্বার্থপরতার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারলুম না! কারণ, আমি আমার এ-ঘরে আসা ব্যাপারটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করতে পারি না। তুমি কাল সকালেই আমায় নিয়ে চল বিনয়-দা, আমি যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দি[illegible] নিশ্চিন্ত হই; পরের বোঝা মাথায় নিয়ে মিথ্যে লোকের ক[illegible] অপবাদ বা প্রশংসা অর্জ্জন করতে আমি চাই নে—লোককে কথা বলবার অবকাশ দিতে আম নারাজ।"

উৎসার সুমতি হওয়ায় বিনয় খুশী হইল বড় কম নয়।

*   *

*

অজয় বিছানায় বসিয়াছিল, আর দু-একদিন পরে সে বোম্বে চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে। এখানে আসিয়াই তাহার চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কয়টা দিন জ্বর হওয়ায় সে যাইতে পারে নাই।

অজয়ের পিতা কাশীবাস করিবেন বলিয়া এখানে একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন, মা মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া থাকিতেন। অজয় কদাচিৎ আসিত, দু' এক দিন থাকিয়া চলিয়া যাইত, কাশী সে মোটেই পছন্দ করিত না। এবার বাধ্য হইয়া তাহাকে কুড়ি বাইশ দিন কাশীবাস করিতে হইয়াছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ধরণীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—দূরে নিকটে ঠাকুরবাড়ীগুলিতে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। মা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছেন—এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত এবার কোন ঠাকুরবাড়ী যান নাই, পুত্রের অসুখ লইয়া বিব্রত হইয়াছিলেন।

অজয় চাহিয়াছিল জানালা-পথে,—বাহিরের দিকে যে পাতলা অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছিল তাহারই পানে;—আকাশে চাঁদ, তারা আজ কিছুই ছিল না, শ্রাবণের মেঘে সব একাকার হইয়া গিয়াছিল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা হইতে বিনয়বাবু আসিয়াছেন, তিনি একবার দেখা করিতে চান—।

সোনার সংসার

"বিনয়বাবু—বিনয়...."

অজয় মনে করিয়া লইল—বিনয় কে। উৎসার দাদা বিনয়, উৎসা একমাত্র আত্মীয় বলিয়া বিনয়কেই চেনে; বিনয়ও উৎসাকে বড় স্নেহ করে—ভালবাসে।

উৎসারই কোন সংবাদ লইয়া বিনয় আসিয়াছে কি? অজয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; বলিল, "তাকে নিয়ে এসো এখানে—"

সে শ্রান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

দরজার পর্দা সরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিল বিনয়, অজয় কেবলমাত্র বলিল, "এসো—!"

একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সে বলিল, "বসো।"

বিনয় বসিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ অজয়?···বড় রোগা হয়ে গেছ দেখছি, দেখে হঠাৎ চেনবার যো নেই!

"আবার চেনা—" অজয় হাসিল; "ভালোই আছি বিনয়, পরশু বোধ হয় বোম্বে যাব—যদি মা ছেড়ে দেন!"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "পথ্য করেছ?"

অজয় বলিল, "আজ করেছি।"

বিনয় বলিল, "যে রকম তোমার শরীরের অবস্থা, তাতে পরশুদিনই তোমার বার হওয়া উচিত হবে না অজয়, আর দশ-বার দিন না গেলে তোমায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

অজয় হাসিল, সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "তারপর—কলকাতার খবর কি,—উৎসা ভাল আছে?"

বিনয় বলিল, "আছে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "একটি মেয়ের পরে রাগ করে তুমি এ কি করছো বল দেখি অজয়? তোমার পাগলামি দেখে সত্যি আমি হাসবো না কাঁদবো তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

শান্তকণ্ঠে অজয় বলিল, "রাগ,...না বন্ধু, উৎসার 'পরে আমি রাগ করিনি, করতেও পারবো না। আমি রাগ করি নি, বড় কষ্ট পেয়েই সব ছেড়ে এসেছি।"

বিনয় বলিল, "আর সে মেয়েটির মাথার 'পরে এত বোঝা চাপিয়ে এলে—সে কি করবে, কেমন করে বোঝা সামলাবে তা ভেবেছ? তুমি যত দুঃখ পেয়েছ, সে যে তার চেয়েও বেশী দুঃখ পাচ্ছে, সে কথাটা মনে করেছ বন্ধু—?"

অজয় চুপ করিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "উৎসা আমার সঙ্গে এখানে এসেছে তোমার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করতে, তাকে ক্ষমা করো অজয়—"

"উৎসা—উৎসা এসেছে—"

অজয় উঠিয়া বসিল, "উৎসা এসেছে···কোথায়—?"

বিনয় ডাকিল, "উৎসা! ঘরে এস, অজয় তোমায় ক্ষমা করবে, তুমি এস!"

ধীরে ধীরে উৎসা গৃহে প্রবেশ করিল।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এবার তোমরা কথাবার্ত্তা বল, আমি খানিক বাইরে গিয়ে বসি। এতটা পথ ট্রেণে এসে গরমে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। একটা কথা বলে যাই অজয়···উৎসা, মাথা ঠাণ্ডা করে কথাবার্ত্তা বলো,—দু'জনেই দু'জনকে ক্ষমা করো;

কারণ দোষ তোমাদের দু'জনেরই, কেউ একা দোষ কর নি। তোমরা সুখী হও—সোনার সংসার পাতাও, আমরা দেখে আনন্দ পাই, আমাদের এইটুকুই হবে পরম লাভ।"

সে বাহির হইয়া গেল।

উৎসা দাঁড়াইয়া রহিল—অগ্রসর হইতে সে পারিতেছিল না।

রুদ্ধকণ্ঠে অজয় ডাকিল, "এলেই যদি—অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন উৎসা! আমার কাছে এস,—আমার সঙ্গে কথা বল।"

উৎসা তাহার পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল, চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, —বল—আমার দোষ তুমি নাওনি—?"

"না, উৎসা—তোমার দোষ আমি নেই নি। তুমিও আমায় ক্ষমা কর উৎসা!—আমি তোমায় অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা দিয়েছি।"

অজয় উৎসার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া উৎসার মাথায় পড়িতে লাগিল।

*　*　*

সরিতের বিবাহ—

পাত্রী মৃণাল।

নিমন্ত্রিত উৎসা স্বামীর সহিত অনেককাল পরে গ্রামে ফিরিয়াছে।

তাহাদের ঘরখানা সরিতের যত্নে আজও দাঁড়াইয়া আছে। উৎসা সেই ঘরের ভিতর গিয়া লুটাইয়া পড়িয়া স্বর্গগতা জননীকে প্রণাম করিল —আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল।

সরিত-দা'র বিবাহে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সরিত ও মৃণালকে যে উপহার দিল, তাহা দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিল।

বিবাহশেষে যখন উৎসা অজয়ের সহিত কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন সতীশবাবু উৎসাকে ডাকিলেন—"একটা কথা আছে মা, বিশেষ গোপনীয় কথা—"

উৎসা বলিল, "বলুন!"

সতীশবাবু তাহাকে একটি নির্জ্জন-গৃহে লইয়া গেলেন।

ড্রয়ার খুলিয়া দুই গোছা নোট বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় কিছু উপহার দিতে চাই উৎসা,…এই তিন হাজার টাকা দিচ্ছি—নাও!"